Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

শ্রমজীবী শ্রেণী নিজেদের বিকাশের গতিপথে, প্রচলিত নাগরিক সমাজকে নিজেদের সাংঘিক সমাজের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করবে। সেই অভীষ্ট সাংঘিক সমাজ প্রতিটি শ্রেণী এবং তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের বিলুপ্তি ঘটাবে। তথাকথিত রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটবে, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতাই হল নাগরিক সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত দ্বন্দ্বের প্রাতিষ্ঠানিক দ্যোতনা।

—কার্ল মার্ক্স

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১
ভয়াবহ বেকারত্বের অবসান চাই ১
দেশে-বিদেশে ২
শ্রীলঙ্কা : ঋণ সমস্যা ও ..... সঙ্কট ৩
ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে ৪
ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৫
ময়ূরাক্ষীর তীরে আলু চাষ ৬
কলকাতায় আর ওয়াই এফের চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন ৭
সস্তায় বিক্রি এলআইসি'র শেয়ার ৮

68th Year 51th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 14th May & 21st May 2022 [Joint Issue]

সম্পাদকীয়

বিভাজন ও আর্থ সামাজিক অরাজকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন

সংঘ পরিবারের অক্টোপাসের মতো আলিঙ্গনে ভারতের আর্থরাজনৈতিক পরিবেশ শুধু নয়, নাগরিক জীবনও শ্বাসরুদ্ধ। একদিকে স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপনে মোদী সরকার জনগণের অর্থে সীমাহীন বাগাড়ম্বর সহযোগে দেশের বহুত্ববাদী ঐতিহ্য পদদলিত করে সবকিছু হিন্দুত্ববাদী আবরণে ঢেকে ফেলছে। অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি, দ্রুত হারে টাকার দামের পতন, উৎপাদনের হার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্বের রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে অতিমারি লকডাউনের পর রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মোদীর গোয়ার্তুমি-অর্থনীতি নোটবন্দি জিএসটি প্রভৃতির ফলে দেশের অর্থনীতির চরম বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অথচ এই ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থানে বিজেপি'র যেন কিছু আসে যায় না। দেশের বিরাট সংখ্যক যুবসমাজকে এক বেপরোয়া জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী কার্যক্রমের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী দুর্বৃত্তায়নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এক মারাত্মক শ্লোগান সংঘ পরিবার ছড়িয়ে দিচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধ্যুষিত সমাজে। কাশ্মীর ফাইল, হিজাব, গোমাংস ইত্যাদি অসংখ্য আবর্জনা দিয়ে জমি তৈরির পর আবার সেই মন্দির-মসজিদ ইস্যুতে ফিরে আসা, ''অযোধ্যা তো অব হামারি হ্যায়। কাশী মথুরা কুতুবমিনার কি বারি হ্যায়।'' কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদের পর তাদের লক্ষ্য মথুরায় তথাকথিত পৌরাণিক গল্প অনুসারী শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান লাগোয়া মসজিদে নামাজপাঠ বন্ধ করে মুসলমানদের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা। শীর্ষ আদালত বেনারসের জ্ঞানবাপী মসজিদ ও শিবমন্দির সংক্রান্ত সংঘর্ষের নিরসনে ১৯৯১ সালের ধর্মীয় উপাসনা ও আচার আচরণের ঐতিহ্য বজায় রাখার আইন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তথাপি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি সরকারের প্রশ্রয়ে আদালতের রায়কে অগ্রাহ্য করে বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনামূলক কাজের উত্তেজনা ছড়াচ্ছে।

ইদানীং শীর্ষ আদালত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে মৌলিক অধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা পাঠিয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্যের উচ্চ ও নিম্ন আদালতসমূহ, রাজ্যের প্রশাসন ও শাসকের ক্ষমতার প্রভাবমুক্ত হতে পারছে না। যেমন শীর্ষ আদালতের ১৯৯১ সালের ধর্মীয় উপাসনাস্থলের ঐতিহ্য বজায় রাখার নির্দেশ সত্ত্বেও মথুরার আদালত হিন্দুত্ববাদীদের মামলা গ্রহণ করেছে।

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের কুখ্যাত ১২৪ 'এ' সিডিশন আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার করে বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালত একটি ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচিত হওয়ার অনেক আগেই ঔপনিবেশিক শাসকরা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করত। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানার নেতৃত্বে তিনজনের বেঞ্চ স্বাধীন ভারতে এই দমনমূলক আইনের ন্যায্যতার বহুবর্ষব্যাপী প্রশ্নটাকে একটি ইতিবাচক সম্ভাবনা ও সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করেছে।

মোদী সরকারের সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতার বক্তব্যে মনে হয়েছে, সরকার এই আইনের পর্যালোচনা করে পুরানো অবস্থান পরিবর্তনে আগ্রহী। তবুও এই সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েই আপাতত এই আইনের প্রয়োগ সরকারের অবস্থান স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এই অন্তর্বর্তী রায় অবশ্যই অভূতপূর্ব এবং ঐতিহাসিক। বিশেষ করে এই মুহূর্তে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য স্বাগত। কিন্তু সর্ষের মধ্যেই তো ভূত। এই রায় ঘোষণার পরেই কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর মন্তব্যে সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আর বিশেষ সন্দেহ থাকে না। রিজিজু সংঘপরিবারের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, সংবিধানের অন্ধ অনুসরণ করতে গেলে বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট না হয়, সেই বিষয়ে সচেতন থাকা সরকারে কর্তব্য। শীর্ষ আদালতের ভবিষ্যত বিচার বিশ্লেষণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ আলোচনা না করেও অনেকেই মনে করেছেন যে, প্রথম রাতেই বেড়াল মারার কৌশলে এই সুযোগে ১২৪ 'এ' আইনটি সরাসরি প্রত্যাহারের নির্দেশ দিতে পারলে হয়তো ভালো হতো। কারণ এই ফ্যাসিস্ট দলটি দেশের গণতন্ত্র ধ্বস্ত করতে বদ্ধপরিকর। সংশোধন বা পর্যালোচনা বাহানায় অন্য কোনো গণতন্ত্র লুণ্ঠনকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হিটলারের মতো এদেরও বাধে না। দেশের প্রায় সর্বত্র তাদের কাজকর্মে তার অজস্র নিদর্শন।

ভয়াবহ বেকারত্বের অবসান চাই

পেট্রোপণ্যসহ সমস্ত জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতেই হবে

লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে পথে নামছে বামপন্থী দলগুলি। ২৫ মে থেকে ৩১ মে দেশজুড়ে জঙ্গি প্রতিরোধ ও বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্তরের পাঁচ বামপন্থী দল।

শনিবার এক বিবৃতিতে সিপিআই (এম), সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন বলেছে অপ্রতিহত গতিতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। জনগণের কাঁধে নজিরবিহীন বোঝা চাপছে। কোটি কোটি মানুষ দুর্দশায়। গভীর দারিদ্রে ডুবে যাচ্ছেন, বাড়ছে অনাহার। বেনজির মাত্রার বেকারের সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির এই বোঝা জনগণের যন্ত্রণাকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে।

বামপন্থী দলগুলি বিবৃতি দিয়ে বলেছে—

● গত এক বছরে পেট্রোপণ্যের দাম বেড়েছে ৭০ শতাংশ, তরিতরকারির দাম বেড়েছে ২০ শতাংশ, ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে ২৩ শতাংশ, দানাশস্যের দাম বেড়েছে কমপক্ষে ৮ শতাংশ।

● কোটি কোটি ভারতীয়ের মূল খাদ্য গমের দাম বেড়েছে ১৪ শতাংশের বেশি। গমও এখন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। সম্পূর্ণ অসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। গমের সংগ্রহ কমে গেছে। গত বছরের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকার অর্ধেক পরিমাণ গম কিনেছে। গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন, সংগ্রহ ২০ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি হবে না।

বামপন্থী দলগুলি বলেছে—

● একদিকে পেট্রোপণ্য ও রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকা, অন্যদিকে গমের আকাল সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধির জন্ম দিয়েছে। কয়লার অভাবের কথাও বলা হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুতের দামও ক্রমশ বাড়ছে।

বামপন্থীদের দাবি—

● এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্ত পেট্রোপণ্যের ওপরে সমস্ত সেস, সারচার্জ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। রেশনের মাধ্যমে গমের সরবরাহ পুনরায় চালু করতে হবে। মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলায় গণবন্টনকে শক্তিশালী করতে হবে।

বামপন্থীদের সুনির্দিষ্ট দাবি হলো:

● পেট্রোপণ্যের ওপর থেকে সমস্ত সেস, সারচার্জ প্রত্যাহার করো; গণবন্টনের মাধ্যমে গম সরবরাহ করো। ডাল, ভোজ্য তেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য রেশনের মাধ্যমে সরবরাহ করো।

● আয়করদাতা নয় এমন সমস্ত পরিবারকে নগদে মাসিক ৭৫০০ টাকা দিতে হবে;

● গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে রেগার বরাদ্দ বাড়াতে হবে; বেকার ভাতার কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করো। শহর এলাকায় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প চালু করতে হবে। সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

এই দাবিগুলিকে সামনে রেখে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ জঙ্গি গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে আহ্বান জানিয়ে বামপন্থী নেতৃত্ব বলেছেন, ২৫-৩১ মে দেশব্যাপী এই লড়াই গড়ে তুলতে হবে। জনগণকে শামিল করে জঙ্গি প্রতিরোধ গড়ে তুলে মোদী সরকারকে জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহারে বাধ্য করতে হবে।

এদিনের বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন সীতারাম ইয়েচুরি (সিপিআই (এম)), ডি রাজা (সিপিআই), দেবব্রত বিশ্বাস (ফরওয়ার্ড ব্লক), মনোজ ভট্টাচার্য (আরএসপি), দীপঙ্কর ভট্টাচার্য (সিপিআই এম-এল-লিবারেশন)।

বর্তমান লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ও বেনজির বেকারত্বের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য বামফ্রন্ট সভায় আলোচনা হয়। অপ্রতিহত গতিতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। জনগণের কাঁধে নজিরবিহীন বোঝা চাপছে। কোটি কোটি মানুষ আর্থিক দুর্দশা ও দারিদ্রে ডুবে যাচ্ছে। বাড়ছে অনাহার। বেনজির মাত্রার বেকারত্বের সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির এই বোঝা জনগণের জীবন যন্ত্রণাকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে। পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে— গত এক বছরে পেট্রোপণ্যের দাম বেড়েছে ৭০ শতাংশ, তরকারির দাম বেড়েছে ৯০ শতাংশ, ভোজ্য তেলের দাম বেড়েছে ২৩ শতাংশ, দানাশস্যের দাম বেড়েছে ৮ শতাংশ। কোটি কোটি ভারতীয়র মূল খাদ্য গমের দাম বেড়েছে ১৪ শতাংশের বেশি। গমের সংগ্রহ কমে গেছে। গত বছরের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকার অর্ধেক পরিমাণ গম কিনেছে। গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন কিন্তু সংগ্রহ মাত্র ২০ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি হবে না।

একদিকে পেট্রোপণ্য ও রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকা এবং অন্যদিকে গমের আকাল সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধির জন্ম দিয়েছে। কয়লার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। ফলে বিদ্যুতের দামও ক্রমশ বাড়ছে।

এর পর ৭ পাতায়

মেরুকরণের রাজনীতিকে তুরুপের তাস করে আগামী সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি'র মাঠে নামার উদ্যোগ?

রামমন্দির, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর এবার দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার পথে এগোচ্ছে বিজেপি। শুরুতে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই আইন পাশ করানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে হিন্দু ভোট মেরুকরণের লক্ষ্যে গোটা দেশের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) সংসদে আনতে চায় বিজেপি। বিজেপি ভাল ভাবেই জানে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে মুসলিমদের পার্সোনাল ল' বোর্ডের অস্তিত্ব থাকবে না। বিরোধিতায় নামবে সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজ এবং বিরোধীরা। এই সুযোগে ভোটের আগে আরও মেরুকরণের তাস খেলার সুযোব পাবে বিজেপি।

ইতিমধ্যে উত্তরাখণ্ডে এই বিল আনার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে উত্তরাখণ্ডের বিজেপি পরিচালিত সরকার। উত্তরাখণ্ডের পথেই অন্যান্য বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতেও এই আইনের অনুমোদনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে ২০০-র বেশি জনজাতি তাদের নিজস্ব আইন মেনে চলেন। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে কোপ পড়বে তাতেও। এই আইন সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চেয়ে বিভাজন ঘটাবে এমনই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।

রামমন্দির নির্মাণ, জম্মু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার শিক্ষায় গৈরিকীকরণের মতোই সঙ্ঘ পরিবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর প্রশ্নে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উপর নিরন্তর চাপ দিচ্ছে।

আসাম পুলিশের অতি তৎপরতা

কয়েকদিন আগে আসাম পুলিশ অতি উৎসাহের বশবর্তী হয়ে অন্য রাজ্যে উড়ে গিয়ে আপত্তিজনক (?) টুইটবার্তার জন্য গুজরাতের বিধানসভা সদস্য জিগনেস মেভানিকে গ্রেপ্তার করে। কোকড়াঝড় আদালতে জামিনে মুক্ত হওয়ার পরও পুলিশ আরও কঠোর IPC এবং IT Act -এ মেভানিকে আবার গ্রেপ্তার করে। অভিযোগ এক মহিলা পুলিশ কর্তার সঙ্গে অন্যায় আচরণ। তাঁর শ্লীলতাহানির অপচেষ্টা। আদালত পুলিশের এধরনের এক সম্পূর্ণ অলীক অভিযোগের জন্য চরম ভৎর্সনা করে মেভানিকে মুক্তি দিয়েছে। মেভানির প্রথম মারাত্মক অপরাধ এক ট্যুইটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সমালোচনা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ওপরওয়ালাদের তুষ্ট রাখার জন্য মেরুদণ্ডহীন পুলিশ কর্তাদের অধঃপতন কতদূর যেতে পারে, তারই এক উদাহরণ এই ঘটনা। বিজেপি সরকার কেন্দ্রে বা রাজ্যে যেখানেই হোক না, দেশদ্রোহিতার আইনের মতো দানবীয় আইন খেয়ালখুশি মতো অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার জন্য ইদানীং অতি তৎপর হয়ে উঠেছে।

গণতন্ত্রে শেকলে বাঁধা স্বৈরাচারী শাসকের একবার শেকলমুক্ত হলে, কোথায় থামতে হবে তার দিশা থাকে না। এভাবেই স্বৈরাচারের পথ বেয়ে সারা দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাস্তব পটভূমির নির্মিত হয়। মেভানিকে নিয়ে কুনাট্য অনুষ্ঠিত হল ঠিকই কিন্তু বিরোধীদের মেরুদণ্ডহীনতাও কম নিন্দনীয় নয়। প্রসঙ্গত অবশ্যই সঙ্গত প্রশ্ন, দেশদ্রোহী আইন বা এইরূপ অগণতান্ত্রিক অন্যান্য আইনগুলির অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে অবিজেপি'র রাজ্যগুলি থেকে কেন প্রতিবাদের আওয়াজ শোনা যায় না, উত্তরটা বোধহয় কারও অজানা নয়। এই বিরোধী দলগুলিই ক্ষমতাসীন হলে বা যখন ক্ষমতাসীন থাকে একইভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শ বা রীতিনীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে কম তৎপর হয় না। অতএব আপাতত এই ট্র্যাডিশন চলছে চলবে, সিডিশন আইনও, (দমনমূলক আইন) অন্যান্য উন্মত্তের মতো যাকে তাকে দংশন করবে।

ধর্ষিত বিচার ব্যবস্থা

ইতিমধ্যে তিন তিনটি বছর অতিক্রান্ত। ভিমা কোরেগাঁও মামলায় প্রথমে পাঁচজন মানবাধিকার কর্মীকে জেল বন্দি করা হয়েছিল। আগামী ৬ জুন এই কলঙ্কিত ঘটনার তৃতীয় বার্ষিকী একই কল্পিত ষড়যন্ত্রের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আরও ১১ জনকে। পরে ভিমা কোরেগাঁও মামলায় অভিযুক্ত কারা এই ১৬ জন নারী পুরুষ। এঁরা বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি, কবি, অধ্যাপক, সাংস্কৃতিক-মানবাধিকার কর্মী এবং ৮৪ বছর বয়স্ক এক খ্রিস্টান ধর্মযাজকও একই মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। ফাদার স্ট্যান স্বামী অবশ্য এখন কারাগারের দুঃসহ বন্দী জীবনযন্ত্রণার বাইরে, অত্যাচারিত দলিত মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ মানুষটি প্রয়াত।

ভিমা কোরেগাঁও যুদ্ধের দ্বিশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনের দিনটি ছিল জানুয়ারির, ২০১৮। মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার অন্তর্গত ছোট্ট গ্রাম কোরেগাঁওতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ৫০০ জন দলিত সেনা পেশোয়াদের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছিল। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত হাজার হাজার দলিত এবং মাহার সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ ভিমা কোরেগাঁওয়ের যুদ্ধের গৌরবজনক দিনটির দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য সমবেত হয়েছিলেন ভিমা কোরেগাওতে। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঐ সমাবেশে হিংসাত্মক ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়। প্রথমে পুলিস ঘটনাটির তদন্ত করে। হিন্দুত্ববাদী নেতা মিলিন্দ একবোটে এবং সম্ভাজী বিদেকে অল্প সময়ের জন্য দলিত সমাবেশে হিংসাত্মক কাজের জন্য গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু এই ঘটনার কয়েক মাস পর পুলিশ হঠাৎ দাবি করে ভিমা কোরেগাঁওয়ের হিংসাত্মক ঘটনার জন্য আসলে দায়ী কতিপয় বামপন্থী কর্মী এবং বুদ্ধিজীবিরা, BK-16 মামলায় অভিযুক্ত ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে এরা হিংসাত্মক অভ্যুত্থানের জন্য দলিতদের উত্তেজিত করেছিলেন। এমন কি, প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার জন্যও এই ১৬ জন বামপন্থী বুদ্ধিজীবি ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

এই ঘটনার পর তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও রাজ্য প্রশাসন এই ১৬ জন ভয়ঙ্কর (!) ষড়যন্ত্রীদের কাঠগড়ায় হাজির করাতে পারে নি, নির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে।

BK-16 মামলায় অভিযুক্ত ১৬ জন আজও জামিনে মুক্ত হওয়ারও সুযোগ পেলেন না। বিনা বিচারে সুদীর্ঘ তিন বছর কারাগারে দিন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন একজন তো পৃথিবী থেকেই বিদায় নিয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন। এই ১৬ জন বিশিষ্ট মানুষ যে, রাষ্ট্রের নজরে কোনো অপরাধে লিপ্ত ছিলেন না, তা প্রমাণের সুযোগ পাননি গ্রেপ্তার হওয়ার তিন বছর পরও। দেশের বিচার ব্যবস্থাকে কতটা কালিমালিপ্ত করা যেতে পারে তারই এক চরম উদাহরণ মহারাষ্ট্রের রাজ্য প্রশাসন।

আইনের অপব্যবহার করে, মিথ্যা অভিযোগে প্রশাসন কিভাবে নির্দোষ, এমনকি, সমাজের নানা স্তরের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব হলেও মানুষের হেনস্তা করতে পারে তারই উদাহরণ BK-16 মামলা। বিনা বিচারে বন্দী মানুষগুলি কারাগারে কি নির্যাতন ভোগ করছে, তার একটি উদাহরণ দিয়েই এই প্রসঙ্গটি শেষ করা হচ্ছে—BK-16-এ বন্দীদের সঙ্গে আধার কার্ড না থাকায় কোভিড প্রতিরোধক ভ্যাক্সিন নেওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত।

কারাগারে বন্দীদের এবং বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দীদেরও অসুস্থ অস্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধ্য করাটাই কি প্রশাসনের বিশেষ কর্মসূচি হয়েছে বর্তমান জমানায়! এখন তো ঘোষণা অনুযায়ী এই কারাগারকে সংশোধনাগার বলা হয়।

অথচ সত্যিই কৌতুকের ব্যাপার, সম্প্রতি (৩০ এপ্রিল) রাজ্যগুলির প্রধান বিচারপতি এবং মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদাত্ত আহ্বান ছিল—"I appeal to all Chief Ministers and Chief Justice of High Courts to prioritise undertrials on the basis of humanitarism and law."—অর্থাৎ মানবিক দৃষ্টি এবং আইন মোতাবেক সব বিচারাধীন বন্দীদের বিচারের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য আবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিগত তিন বছর ধরে বন্দী BK-16 মামলায় বন্দীদের বেলায় এই ব্যতিক্রম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে—প্রধানমন্ত্রী অথবা সম্মেলনে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীরা না কি বিচারকবৃন্দ?

এক নজরে পশ্চিম বাংলার বিদ্যুৎ উৎপাদন

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ১৫৪২ মেগাওয়াট।

রাজ্য সরকারি সংস্থা — ৯০২ মেগাওয়াট ; সিইএসসি — ৩৫০ মেগাওয়াট ; ডিভিসি— ২৯০ মেগাওয়াট । **মোট —১৫৪২ মেগাওয়াট।**

১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১'র মে মাস পর্যন্ত এটা বেড়ে হয় ১১৪৪৯ মেগা ওয়াট।

রাজ্য সরকারি সংস্থা :৬১৪৯.৫ মেগাওয়াট ; সি ই এস সি : ১২৩০.০ মেগাওয়াট ; ডিভিসি : ১৮৪০.০ মেগাওয়াট ; ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র : ২১০০.০ মেগাওয়াট ; অন্যান্য :১৩০.০ মেগাওয়াট; **মোট :১১৪৪৯.৫ মেগাওয়াট।**

এছাড়া কাজ চলছিল ৮৫০০ মে. ওয়াটের। যেটা সারা ভারতের মধ্যে ছিল নজিরবিহীন ঘটনা।

ওই সময়কালের মধ্যে নির্মিত রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উৎপাদন ছিল—

কোলাঘাট ৬টি ইউনিট ১২৬০ মে. ওয়াট; বক্রেশ্বর ৫টি ইউনিট ১০৫০ মেগাওয়াট; সাগরদীঘি ২টি ইউনিট ৬০০ মেগাওয়াট; ব্যান্ডেল ১টি ইউনিট ২১০ মে. ওয়াট; সাঁওতালডিহি ২টি ইউনিট ৫০০ মেগাওয়াট ; পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ ৪টি ইউনিট ৯০০ মেগাওয়াট; ডিপিএল ১টি ইউনিট ৩০০ মেগাওয়াট। **মোট : ৪৮২০ মেগা ওয়াট**

বেসরকারি সংস্থাগুলি থেকে :

টিটাগড় ৪টি ইউনিট ২৪০ মে. ওয়াট; সাদার্ন ২টি ইউনিট ১৩৫ মেগাওয়াট; বজবজ ৩টি ইউনিট ৭৫০ মেগাওয়াট; টাটা পাওয়ার ১টি ইউনিট ১১০ মেগাওয়াট। **মোট : ১২৩৫ মেগাওয়াট।**

এছাড়াও জলবিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনও ছিল।

বামফ্রন্ট সরকারের পর আর এক ওয়াট বিদ্যুৎও তৃণমূল সরকারের আমলে উৎপাদিত হয়নি।

মে দিবসে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত

বলিভিয়ার বামপন্থী সরকার শ্রমিক ইউনিয়ন-এর নেতৃত্ব এবং দেশের শ্রমদপ্তরের মন্ত্রী একাধিক জনপ্রতিনিধিদের সামনে ঘোষণা করেন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে সারা দেশে ন্যূনতম ৪ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করা হল।

নতুন অসুখ

শুধু এদেশেই নয়, সারা বিশ্বেই একটি নতুন অসুখ এসে গিয়েছে যার নাম 'গেমিং ডিসঅর্ডার'। WHO সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া এই রোগটিকে ব্যবহারগত অসুখ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। নেশার সমতুল্য এই অসুখের উপসর্গগুলি হচ্ছে, মাথা ধরা, বমি ভাব, অনিদ্রা, খারাপ মেজাজ, ধৈর্য ও মনযোগের অভাব, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ইত্যাদি। মেরুদণ্ডের অসুখের এ আশঙ্কা করা হচ্ছে। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনে খেলার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারই এই রোগের উৎস—ক্রমশ এই রোগ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা দুরূহ বলেই মনে হচ্ছে।

আগামী প্রজন্মের স্বার্থে অবিলম্বে এমন মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রচারাভিযান প্রয়োজন।

এগিয়ে বাংলা

- ২০১১ থেকে মদের দোকান বেড়েছে ২১০০০টি।
- গত এক বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমেছে ৩৩০০০ জন।
- হৃদরোগের শিক্ষক চিকিৎসক চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন। নির্মল মাঝির অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করে অপসারিত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। ডাক্তারদের হাজিরায় প্রক্সি দিচ্ছে গ্রুপ ডি কর্মী। মেয়াদ উত্তীর্ণ স্টেন্টের ব্যবহার চলছে। বাংলা অবশ্যই এগিয়ে!

চিনের বিশেষ প্রতিনিধির দক্ষিণ কোরিয়া সফর

৪ মে, সিওল : দক্ষিণ কোরিয়ার নানা অঞ্চলে সমস্যাবলী দেখভাল করার জন্য সম্প্রতি চিন এক বিশেষ প্রতিনিধি লিউ জিয়াওমিং দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে পৌঁছেছেন। দুই দেশের প্রতিনিধিরা কোরিয়ান ভূখণ্ডের সঙ্কটময় পরিস্থিতির সমাধানকল্পে আলোচনা শুরু করেন। এই বৈঠকে দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে সব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি স্থায়ী পর্যবেক্ষক কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত এ বছরেই উত্তর কোরিয়া এক ডজনেরও বেশি পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা করেছে। উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্র এবং আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে।

শ্রীলঙ্কা : ঋণ সমস্যা ও সামাজিক সঙ্কট

শ্রীলঙ্কার প্রবল পরাক্রমী (প্রাক্তন) প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসের করুণ পরিণতি দেখে একটাই কথা মনে আসছে—আজ যে রাজা কাল সে ফকির। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে তিনি কোনভাবেই ফকির নন বরং দেশের আপামর জনগণকে বছরের পর বছর ধরে ফকির বানিয়ে ছেড়েছেন। যাই হোক লাগাতার জনরোষের ফলে ৯ মে রাজাপাকসে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তিনি ও তাঁর পরিবার আশ্রয় নেন ত্রিঙ্কোমালির নৌ-ঘাঁটিতে।

অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে সামাজিক সঙ্কট

শ্রীলঙ্কার মানুষ এই মুহূর্তে এক ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে লড়াই করছে। জরুরি অবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিক্ষোভের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আটজন নিহত এবং ২০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। রাজাপাকসে পরিবার এবং বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও নেতার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীকে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহের আগুন স্তিমিত হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। সরকার ও রাজনীতিবিদদের ওপর রোষের আগুন গোটা দ্বীপরাষ্ট্রে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। মাহিন্দা পদত্যাগ করলেও তাঁর ছোট ভাই এবং দেশের রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপাকসে এখন পর্যন্ত তাঁর পদত্যাগের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু চাপ বাড়ছে। বিরোধী দলনেতা রণিল বিক্রমাসিঙ্ঘেকে প্রধানমন্ত্রী পদে বসিয়ে মানুষের ক্ষোভ সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু জনতা এত তাড়াতাড়ি রণে ভঙ্গ দেবে বলে মনে হচ্ছে না।

শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সঙ্কট এই মুহূর্তে যা সামাজিক সঙ্কটের রূপ নিয়েছে। কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ এই সংকটের মূলে আছে নয়াউদারনীতির হাত ধরে একের পর এক সরকারের অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা। সরকারের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত দেশটিতে দ্বৈত ঘাটতি তৈরি করেছে এবং ধীরে ধীরে তা দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতিতে পরিণত হয়েছে। এই দ্বৈত ঘাটতি হলো—চলতি হিসাবের ঘাটতি এবং বাজেট ঘাটতি। ২০১৯ সালে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) একটি ওয়ার্কিং পেপারে বলা হয় 'শ্রীলঙ্কা ইজ এ ক্লাসিক টুইন ডেফিসিট ইকোনমি'। টুইন ডেফিসিট সংকেত দেয়—একটি দেশের জাতীয় ব্যয় তার জাতীয় আয়ের চেয়ে বেশি এবং দেশটির বাণিজ্যিক পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন অপর্যাপ্ত। কিন্তু, বর্তমান সংকটের আরও একটি কারণ ২০১৯ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় রাজাপাকসের বড়োলোকদের কর হ্রাসের প্রতিশ্রুতি। কারণ, করোনা মহামারি শুরুর কয়েক মাস আগে শ্রীলঙ্কা সরকার কর হ্রাসের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে। যা শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির বড় একটি অংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এদিকে, মহামারির কারণে দেশের লাভজনক পর্যটন শিল্প এবং বিদেশি শ্রমিকদের রেমিট্যান্স সরবরাহ কমে যায়। ফলে, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো শ্রীলঙ্কাকে ডাউনগ্রেড করতে শুরু করে। ফলে, একসময় দেশটির জন্য কার্যকরভাবে আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার বন্ধ হয়ে যায়। এতে এসব বাজারের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল শ্রীলঙ্কার ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রোগ্রাম লাইনচ্যুত হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দুই বছরের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ কমে যায়।

বৈদেশিক ঋণের বোঝা

অবশ্য গত কয়েক বছর ধরেই শ্রীলঙ্কায় বৈদেশিক ঋণের বারুদ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, অতিমারী এবং লকডাউন তাতে স্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে। এর ফলে গত ১২ এপ্রিল শ্রীলঙ্কা সরকার ঋণখেলাপী ঘোষণা করেছে। ২০১৯ অর্থবর্ষে শ্রীলঙ্কার মোট সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৭.৬৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ তা কমে দাঁড়িয়েছে ২০২৫.০৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দেশজুড়ে প্রবল মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়েছে। ২০২২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে যেখানে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল ১৬.৮ শতাংশ, ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসেই সেই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭.৫ শতাংশ। এর ফলে চাল, ডাল থেকে শুরু করে পেট্রোল, ডিজেল সব কিছুর দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে পৌঁছে গেছে। বর্তমান অবস্থার মোকাবিলা করতে শ্রীলঙ্কা সরকার আই এম এফের দরজায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণের আর্জি নিয়ে কড়া নাড়ছে। এই অর্থ ব্যবহার করে তারা ঋণশোধ বজায় রাখবে। এই অবস্থায় আই এম এফের কাছে ঋণ নেওয়া আপাত দৃষ্টিতে সবথেকে সহজ রাস্তা মনে হলেও দুটি প্রধান প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথমত পুনরায় ঋণ নিয়ে কি এই সামগ্রিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব আর শ্রীলঙ্কার বর্তমান অবস্থা আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কী কী শিক্ষা দেয়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টতই বলা যায় যে, একটি ঋণের উপর পুনরায় ঋণ নিয়ে কোনভাবেই ঋণ সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম উদাহরণ কম যে, একটি নতুন ঋণ পুরনো ঋণ শোধ করতে সাহায্য করেছে। শ্রীলঙ্কার এই ঋণ সমস্যার প্রধান কারণ লুকিয়ে সেই দেশের সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যে। বিগত দিনে শ্রীলঙ্কা বিভিন্ন বড় বড় প্রকল্প গড়তে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে দেদার ধার করেছে। কিন্তু সেই সমস্ত প্রকল্প থেকে যে আয় হবে বলে মনে করা হয়েছিল তা হয়নি। এর ফলে

শঙ্খ শুভ্র বিশ্বাস

ঋণের বোঝা বাড়তে শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় হাম্বানটোটা বন্দর তৈরির লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কা ২০০৭ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে চিন থেকে ১.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ নেয় প্রাথমিক ভাবে ১ শতাংশ এবং ২ শতাংশ সুদে কিন্তু পরবর্তীতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৩ শতাংশে। কিন্তু ২০১০ সালে এই বন্দর চালু হলেও কলম্বো বন্দরের নৈকট্যের কারণে লোকসানের মুখ দেখে। এই ঋণের বোঝা সামলাতে না পেরে শ্রীলঙ্কা ১.১২ বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে এই বন্দরের ৮৫ শতাংশ চিনের সরকারি কোম্পানিকে ৯৯ বছরের ইজারা দেয়। এছাড়াও পরবর্তীতে ১.৪ বিলিয়ন ডলার ঋণ শ্রীলঙ্কা সরকার গ্রহণ করেছে কলম্বো পোর্ট সিটি প্রজেক্ট গড়ে তুলতে, যে প্রকল্পের মধ্যে প্রধানত গড়ে তোলা হবে ক্যাসিনো, গ্রিনজোন, রিয়াল এস্টেট ইত্যাদি। সমুদ্র বুজিয়ে পোর্ট সিটির পরিকল্পনা পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তদুপরি ২০২০ সাল পর্যন্ত এই সমস্ত প্রকল্প থেকে পরিকল্পিত আয়ের ধারে কাছে পৌঁছানো যায়নি, ফলে ঋণের বোঝা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। একের পর এক প্রকল্প আর্থিকভাবে ডুবে যাওয়ার ফলে শ্রীলঙ্কা সরকার ব্যাপক দেনার দায়ে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

এই মুহূর্তে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে এসেছে তা হল ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে সরকারের এই পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হওয়ার দায় কে নেবে? সরকারী ঋণ কোন ব্যক্তিগত ঋণ নয় বরং জাতীয় ঋণ পরিশোধের দায় থাকে সেই রাষ্ট্রের আপামর জনগণের। তাঁদের করের টাকায় এই ঋণ পরিশোধ করা হয়। ২০১৬ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আয়করের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা সরকারের উপার্জন যেখানে ১৫ শতাংশ, পরোক্ষ কর, অর্থাৎ যে কর কোনো পরিষেবা বা ক্রয়-বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত, তার থেকে উপার্জনের পরিমাণ ৮৫ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে, বিপুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ কর ছাড়ের ফলে উচ্চ আয়ের মানুষের নয়, বরং বিপুল পরোক্ষ করের বোঝার নীচে পিষ্ট হচ্ছেন শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষ। এছাড়াও ২০১৯ সালে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অছিলায় বড় ব্যবসাগুলিকে প্রচুর টাকা কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফলে এই সমস্ত অপরিকল্পিত ঋণের দায় কেন জনগণ নেবে সে প্রশ্ন উঠবেই।

সংকটমোচনে আই এম এফ?

এই অবস্থায় করণীয় কী শ্রীলঙ্কা সরকারের? এর উত্তর আর যাই হোক না কেন আই এম এফের থেকে পুনরায় ঋণ গ্রহণ কখনোই হতে পারে না। ইতিহাস সাক্ষী আছে কিভাবে বারে বারে আই এম এফকে ব্যবহার করে পশ্চিমা দেশগুলি একের পর এক দেশে খোলা বাজার অর্থনীতির নামে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে। কয়েক বছর আগে ২০০৭-১০ সালে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝার ফলে গ্রীসের সাধারণ মানুষের অবস্থা বর্তমান শ্রীলঙ্কার মানুষের মতো হয়ে উঠেছিল। ২০০৪ সালে অলিম্পিকের আয়োজন করতে গ্রীস সরকার যে ঋণ নিয়েছিল অলিম্পিকের পরে সেই ঋণ গ্রীসের মানুষের গলায় মৃত্যু ফাঁদ হিসেবে চেপে বসেছিল। এছাড়াও ১৯৯০-এর দশকে নিকারাগুয়া বা বর্তমানে আর্জেন্টিনা, আফ্রিকার সেনেগাল সহ একাধিক দেশে আই এম এফের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ শোষণ চলেছে। এমনকি শ্রীলঙ্কা বিভিন্ন সময়ে বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির কারণে ২০০৯-২০১৬ এর মধ্যে আই এম এফের সঙ্গে ১৬টি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যার মোট পরিমাণ ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু এত কিছু করেও ঋণের ফাঁদ থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারেনি।

আই এম এফ-এর সঙ্গে দর কষাকষি চলছে ঠিকই, কিন্তু সেই ''সহায়তা (!)'' পেতেও বেশ কিছু মাস কেটে যাবে। ''অর্থ সাহায্য'' কে চরম রক্ষাকর্তা ভাবার দৃষ্টিভঙ্গিটি সর্বতোগ্রাহ্য হয়ে থাকলেও এর মাধ্যমে পরম মোক্ষটি পাওয়ার জন্য ভারী মূল্য চোকাতে হবে।

১২ এপ্রিল শ্রীলঙ্কা সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলির পুনর্বিবেচনা এবং কঠোর সমালোচনা প্রয়োজন। কিন্তু কেন? প্রথমত ওই সিদ্ধান্ত আই এম এফ এবং শুধুমাত্র ব্ল্যাকরকের মতো বৃহৎ বেসরকারি ঋণপ্রদায়ী সংস্থার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। ধরেই নেওয়া যায় বৃহৎ ঋণপ্রদায়ী সংস্থার স্বার্থে সরকার ঋণশোধ স্থগিত রেখেছে। দ্বিতীয়তঃ সরকার একথাও ঘোষণা করেছে যে সম্পূর্ণ বকেয়া সুদসহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণশোধ করতে চায়। তৃতীয়ত আই এম এফ এবং অন্যান্য ঋণপ্রদায়ী সংস্থাগুলিকে ঋণশোধ প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার জন্য তারা আই এম এফ-এর কাছ থেকে একটি আপতকালীন ঋণ চায়। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা পুরনো ঋণ (যার অনেকগুলি অবৈধ) শোধ করতে নতুন ঋণ নেবে।

চতুর্থত শ্রীলঙ্কা সরকার যদি একবার আই এম এফ-এর সঙ্গে চুক্তিটিতে আবদ্ধ হয় আই এম এফ সরকারকে আর্থিক ব্যয়সংঙ্কোচ নীতি অনুসরণ করতে চাপ দেবে এবং সেই চাপ অনিবার্যভাবে এসে পড়বে শ্রমজীবী শ্রেণির ওপর। এই সমঝোতা ও ব্যয়সঙ্কোচ নীতির জন্য বাজেট ঘাটতির বোঝা টানতে হবে তাদেরই। আই এম এফ এর ''সহায়তায়'' সরকার বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছে ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার চেষ্টা চালাবে। সাধারণত এই ধরনের পরিস্থিতিতে এটাই দস্তুর, গত ৩ বছর ধরে আর্জেন্টিনায় এটাই হয়ে এসেছে। আই এম এফ-এর ''সহায়তায়'' আর্জেন্টিনার সরকার বেসরকারি ঋণপ্রদায়ী সংস্থাগুলির সঙ্গে পুনর্বার সমঝোতায় গেছে এবং শেষাবধি ঋণ শোধের পরিমাণে যৎসামান্য ছাড় পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ হল অবৈধ ঋণগুলি, যা শোধ করা অনুচিত, তাকে বৈধতা দান করার প্রক্রিয়া। বর্তমানে শ্রীলঙ্কা সরকার ঠিক এইটাই করতে চলেছে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না।

ঋণ বাতিল ও ঋণের অডিট

শ্রীলঙ্কা বর্তমানে এক গভীর সংকটে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক-আই এম এফ সহ নানা ঋণপ্রদায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া ঋণ ও দ্বিপাক্ষিক ঋণগুলি বাতিল হওয়া দরকার। নিদেনপক্ষে ঋণশোধ স্থগিত হওয়া দরকার এবং বকেয়া ঋণের উপর সুদ বাতিল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঋণপ্রদায়ী সংস্থাগুলি ঋণ নিয়ে স্থায়ী সমাধানে উৎসাহী নয়। তারা শ্রীলঙ্কাকে নতুন করে ঋণ দিয়ে এই সমস্যা জিইয়ে রাখতে উৎসাহী। এই কথাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, চিনের মতো ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

শ্রীলঙ্কা সরকারেরও উচিত ঋণ পরিশোধ বন্ধ রাখা এবং বহুমূল্য বিদেশি মুদ্রা জনগণের প্রাথমিক প্রয়োজনে খরচ করা। কারণ, ব্যবসায়িক ঋণ দেওয়ার প্রধান মাপদণ্ড থাকে ব্যবসার লাভ করার ক্ষমতা। একদিকে শ্রীলঙ্কা সরকার নিজেদের ক্ষমতার (অপ)ব্যবহার করে যথেচ্ছ ঋণ নিয়েছে আর অন্যদিকে ঋণপ্রদানকারী সংস্থাগুলি এই ধরনের প্রকল্পগুলি খতিয়ে না দেখেই দেদার ঋণ দিয়েছে। এখন এই লেনদেনের সম্পূর্ণ বোঝা চাপানো হয়েছে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। সামাজিক ন্যায়ের প্রসঙ্গ মাথায় রেখে একথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, সরকার এবং বড় বড় বাণিজ্যিক ঋণপ্রদানকারী সংস্থার ব্যর্থতার দায় কোনোভাবেই শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষের নয়। এছাড়াও গত কয়েক বছরে সম্পত্তির উপরে বিপুল পরিমাণে ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবিলম্বে সরকারের উচিত সম্পত্তির উপরে ট্যাক্সের পরিমাণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করা এবং সেই আয় দিয়ে সাধারণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অতিমারীর কারণে যেহেতু শ্রীলঙ্কা এই সমস্যার গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাই সেদেশের সরকার আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন ধারা ব্যবহার করে ঋণ স্থগিত রাখতে পারে। যেমন আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন বা fundamental change of circumstances। পরিস্থিতি ঋণগ্রস্ত দেশের হাতের বাইরে চলে গেলে তারা ঋণশোধ স্থগিত রাখতে পারে। কোনো দেশের সরকার অপরিহার্য পরিস্থিতি

এর পর ৮ পাতায়

ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস প্রসঙ্গে

দিলীপ গোস্বামী

ইমান্যুয়েল মাকরঁ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পদে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর ইউরোপ এবং আমেরিকার বোধ হয় স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। দিল্লী প্রশাসনও সম্ভবত উৎফুল্ল—এই মাকরঁই ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের রণনৈতিক অংশীদারত্বের ভিত্তি নির্মাণে বিশেষ তৎপরতার পরিচয় রেখেছেন। মাকরঁ বিরোধী অতি দক্ষিণপন্থী মারিন লে পেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলে ইউরোপের ভূরাজনীতিতে হয়ত নাটকীয় নেতিবাচক পরিবর্তন হতে পারত। ইউরোপীয় জাতি রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব, লে পেন বিজয়ী হলে আরও জোরদার হয়ে পড়ত এমন অভিমতই অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের। লে পেন-এর মতই ইউরোপের অনেক দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বই পুতিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলেছেন। এদের অনেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লে পেনের মতই খড়্গহস্ত। লে পেন বিজয়ী হলে নিঃসন্দেহে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমান ভূমিকার বড় পরিবর্তন ঘটতে পারত; শুধু তাই নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজনৈতিক ভিত্তিতে চিড় ধরার সম্ভাবনা ছিল। ইতিহাসের পরিহাস সোভিয়েত ইউনিয়নের জমানায়, বামপন্থীদের মাধ্যমেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে বামপন্থী প্রভাব বৃদ্ধিতে তৎপর থাকলেও আজকের রাশিয়া ইউরোপের দক্ষিণপন্থীদের উপর নির্ভর করেই রাজনৈতিক ডানা বিস্তারে তৎপর। এ বিষয়ে লে পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য অতি দক্ষিণপন্থী দলগুলিও পুতিনকে সহযোগী মিত্র হিসাবে পেতে খুবই আগ্রহী।

বিগত দু'দশক ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন রণনৈতিক অংশীদারত্ব নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক নির্মাণের বাস্তব সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের অনেকেই ভারত সফরে এসেছিলেন মনে হতেই পারে। রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযান ভারতের নিন্দাবাদে অনীহায় রাশিয়া ও ভারতের সম্পর্কে কোনও পরিবর্তন হয়নি। রাশিয়া বনাম পশ্চিম দুনিয়ার দ্বন্দ্বে ভারত রাশিয়ার সবচেয়ে বড় স্বাভাবিক মিত্র হিসাবেই রয়েছে। তবে সম্প্রতি ভারতের অবস্থানের কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ভারতের নৈঃশব্দের অর্থ এই না যে, ভারত ইউক্রেনের ওপর বোমা বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াটা সমর্থন করছে। পররাষ্ট্রের আঞ্চলিক সংহতিকে মান্যতা দিতেই হবে, এমন কথা বলার মানেই হচ্ছে ভারত রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযান সমর্থন করছে না। নিঃসন্দেহে ইউক্রেন অভিযান ভারতকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে। বিশেষত ভারত চিনের সম্পর্কটা আরও জটিলতর হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে রাশিয়া এবং ইউরোপের সঙ্গে ভারতের স্বাভাবিক সম্পর্কটা সবচেয়ে বেশি কাম্য ছিল। কিন্তু সমস্যা হল, একদিকে যেমন রাশিয়া এবং ইউরোপ -আমেরিকার সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে উঠেছে অপরদিকে ভারতের সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার আর্থ রাজনৈতিক বন্ধনের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটছে। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার ঐতিহাসিক মৈত্রী সম্পর্ক নিয়ে ভারতের দুর্বলতা থাকলেও ভারত পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারছে না। রাজনীতি বা যুদ্ধে কেউ চিরস্থায়ী মিত্র থাকে না। ইউক্রেনের ঘটনাবলিতে একদিকে রাশিয়া আন্তর্জাতিক জগতে ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে বলেই মনে হয়। পাশাপাশি রাশিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষমতাও দুর্বলতর হতে বাধ্য। এমন পরিস্থিতিতে ভারত সম্ভবত পশ্চিমদিকেই ঝুঁকতে পারে। এমন সম্ভবনা প্রবল।

ভৌগোলিক নৈকট্য এবং অর্থনৈতিকভাবে রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের গভীর সম্পর্কের বাস্তবতাও অস্বীকার করা যায় না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে রাশিয়ার বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২৬০ বিলিয়ন ডলার। আর ভারতের সঙ্গে মাত্র ১০ বিলিয়ন ডলার। ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার সামাজিক সম্পর্কের শেকড়ও অনেক গভীরে প্রসারিত। রাশিয়া এবং মস্কোর সাথে আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে, এক শক্তপোক্ত কাঠামো নির্মাণের লক্ষে ইউরোপ-রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর কথা মাকরঁ সহ ইউরোপের অনেক নেতাই বলছেন। এরা বলছেন, সমগ্র বিষয়টি নিয়ে অর্থাৎ, রাশিয়া এবং ইউরোপের বর্তমান টানাপোড়েনের সম্পর্ক নিয়ে পূর্ণ বিবেচনার প্রয়োজন আছে।

ন্যাটোর পূর্বদিকে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি এবং রাশিয়াকে ঘিরে ফেলার রণকৌশল অবশ্যই পুতিনের স্পর্শকাতরতা বাড়িয়েছে এবং ইউক্রেন অভিযান শুরু করায় পশ্চিমের অনেক দেশই বেশ অস্বস্তিতে রয়েছে। বিশেষত, ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার বেশ শক্তপোক্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইউক্রেন যুদ্ধের কি পরিণতি হবে বলা না গেলেও নিঃসন্দেহে রাশিয়া বেশ দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হবেই।

ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত বড় সড় সমস্যাগুলির সমাধান ব্রুসেলস এবং দিল্লীকেই করতে হবে, তবে উভয়েরই আগামী দিনে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে এবং আগামী দিনগুলোতে দুর্বলতর রাশিয়া তেমন কোনো বড় সমস্যা তৈরি করবে না বলেই মনে হয়।

ঘটনা প্রবাহের ইঙ্গিত, ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা তার আগে থেকে ভারতের বিদেশ নীতি যেভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, সেই বিশেষ পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে চলেছে। চিনের প্রশ্নটির আলোচনাও খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ রাশিয়ার সঙ্গে চিনের সম্পর্ক গত দু'দশকে বিগত শতকের ৬০'এর দশকে যেভাবে অবনতি হয়েছিল সেই অবস্থায় নেই। এশিয়া ভূখণ্ডের এই দুই বড় দেশের সম্পর্ক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে এখন বেশ গভীরই বলা যেতে পারে। আগের সেই আদর্শগত সংঘাতও আর নেই। এরা এখন একই পথের পথিক, সমাজতন্ত্রের আদর্শ এখন ধূসর অতীত মাত্র।

মজার ব্যাপার ২০২১-এর জুন মাসে জো বাইডেনের জেনেভাতে পুতিনের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল, বাইডেন রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উৎসাহ প্রকাশ করলেও পুতিন কিন্তু চিনের সঙ্গেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করায় বেশি উৎসাহী হয়েছিলেন। পুতিন চিনে গিয়ে ঘোষণা করলেন, এ এমন এক সম্পর্ক যার কোনও সীমা নেই। রাশিয়া চিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে উদীয়মান বৃহৎ শক্তি চিনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা কোন পথে হবে তা নিয়ে ভারতকে এখনই ভাবতে হবে। মানতেই হবে এ এক জটিল অঙ্ক।

একদিকে যেমন মস্কোর সঙ্গে দিল্লীর বর্তমান স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় থাকছে, অপরদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নও চিনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারতের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াবে বলেই মনে হয়। মস্কোর সঙ্গে বেজিং-এর বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক সখ্যতার এবং আমেরিকা-চিনের সম্পর্কে দ্রুত অবনতির প্রেক্ষিতে ব্রুসেলস ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সচেতন পদক্ষেপ নেবে এমন আশা করা যেতেই পারে।

এমন এক জটিল আর্থ- রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে আমেরিকার অবস্থানটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপ চায় আমেরিকার কবলমুক্ত রণকৌশলগত স্বনির্ভরতা। কিন্তু ইউক্রেন সঙ্কট প্রমাণ করল— যেমন কানু ছাড়া গীত নেই, আমেরিকার উপরও ইউরোপকেও নির্ভর করতেই হবে। তবে আমেরিকা চায় শক্তিশালী ইউরোপ নিজের ঘর নিজে সামলাক। আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লীকে আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে হবে এবং ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে ফলপ্রসূ ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে উঠুক। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলির পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার উর্ধে উঠে আন্তর্জাতিক ভূরাজনৈতিক পরিসরে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

নিষেধাজ্ঞার ফলে অভূতপূর্ব মানবিক সঙ্কটে আফগানিস্তান

আমেরিকাকে আফগানিস্তানের মাটি থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত বাইডেন প্রশাসন আফগানিস্তানের ৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আমেরিকার ব্যাঙ্কে সংরক্ষিত আফগানিস্তানের সম্পদের হস্তান্তর চলবে না, লেনদেন চলবে না। যার মূল্য প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলার। এই অমানবিক সিদ্ধান্তে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্রতম মাত্রায় পৌঁছাবে। দুনিয়ার নজর যখন রাশিয়া ইউক্রেনের সংঘাতের দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই দশক ব্যাপী যুদ্ধে বিধ্বস্ত আফগানিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এক চূড়ান্ত অমানবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। Da Afganistan Bank (DAB)-এর ৭ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ আমেরিকার আফগানিস্তানের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কে (নিউ ইয়র্ক) গচ্ছিত আছে। এই সম্পদের লেনদেন বা হস্তান্তরের উপর বাইডেন প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার ফলে আফগানিস্তানের গরীব সহ সমস্ত মানুষ এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়তে চলেছে। তাছাড়া আফগানিস্তানের আরও ২ বিলিয়ন ডলার ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। তালিবানের উপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা থাকায় এই সম্পদের উপরেও আফগান সরকারের হাত দেওয়া চলবে না, গত বছর পর্যন্ত DAB'র উপরোক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে কোনও অসুবিধার মুখে পড়তে হয় নি।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতোই বাইডেন আরও ঘোষণা করেছেন আমেরিকার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ থেকে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার তুলে নেওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশের অপেক্ষা করছে বাইডেন প্রশাসন। এই অর্থ নাকি ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে সন্ত্রাসী হানায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। অবশ্য ১১ সেপ্টেম্বর (২০০১) এর সন্ত্রাসী হানায় নিজেদের আত্মীয়রা ইতিমধ্যেই মাথা পিছু ২ মিলিয়ন ডলার হিসাবে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে আমেরিকা বা ইউরোপের ব্যাঙ্কগুলিতে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় হিসাবে সংরক্ষিত অর্থ তো আফগানিস্তানে জনগণের। বাইডেন প্রশাসনের এই অনৈতিক কার্যকলাপ আফগানিস্তানের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে আরও বিপর্যস্ত করবেই।

১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হানার ষড়যন্ত্র মার্কিন তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী অবশ্যই আফগানিস্তানের মাটিতে হয়েছিল। নিঃসন্দেহে ঐ সময় আলকায়দার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব আফগানিস্তানেই অবস্থান করছিল। কিন্তু সন্ত্রাস দমনে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের মতে তালিবানের সংযুক্তি ছিল না। যে ১৯ জন দুষ্কৃতী এই হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের মধ্যে ১১ জনই সৌদি আরবের নাগরিক।

এমনিতেই আফগানিস্তানের আর্থিক অবস্থা কোনোদিনই খুব ভাল অবস্থায় ছিল না। উপরন্তু বাইডেন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত আফগানিস্তানের জনসমাজের সর্বস্তরেই পড়বে। প্রায় ভাঙনের মুখে দেশে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, মাসের পর মাস ডাক্তার ও নার্সেরা বিনা বেতনে কাজ করে চলেছেন। হাসপাতালগুলিতে টাকা নেই, ওষুধপত্রের জোগান নেই। দেশের ব্যাঙ্কগুলিতে বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় তলানিতে এসে ঠেকেছে। তালিবান ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আফগান মুদ্রার কমপক্ষে ২৫ শতাংশ অবমূল্যায়ন ঘটেছে। আই এম এফ থেকে বলা হয়েছে দেশের সঞ্চিত মুদ্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে আফগানিস্তানের অর্থনীতি প্রায় পঙ্গুত্বের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে।

বেশির ভাগ আফগান নাগরিক এখন ক্ষুধার্ত, কর্মহীন। যদি জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা না হয় তাহলে, লক্ষাধিক আফগান শিশুর মৃত্যু ঠেকানো যাবে না। বর্তমানে ৮.৭ মিলিয়ন আফগান দুর্ভিক্ষ পীড়িত অবস্থায় দিনযাপন করছে। অনাবৃষ্টির জন্য খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। মানবিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের আবেদন করা হয়েছে। আমেরিকান ব্যাঙ্কে DAB-র গচ্ছিত টাকা ১১ সেপ্টেম্বরে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত বাইডেন প্রশাসন প্রত্যাহার না করলে, এই প্রারোচনামূলক কাজের জবাবে তালিবান যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। বর্তমান সঙ্কটজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সমগ্র মধ্য প্রাচ্য নতুন সঙ্কটের আবর্তে পড়বে।

ইউক্রেন সঙ্কটকে কেন্দ্র করে আমেরিকা পশ্চিম দুনিয়ার সঙ্গে বাকী বিশ্বের যে ভূরাজনৈতিক মেরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাতে এই বার্তার আসল অর্থ বেশ স্পষ্ট।

মার্কিন প্রশাসনের অন্দরমহল এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে তালিবান সরকার এবং আফগানিস্তানের জঙ্গি আন্দোলনকারীদের মধ্যে পার্থক্যটা আমেরিকার বর্তমান প্রশাসনকে বুঝতে হবে। আমেরিকার মাটিতে গচ্ছিত আফগানিস্তানের সঞ্চিত বিদেশি মুদ্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে হতদরিদ্র তালিবানদের বিরুদ্ধে এক জঘন্য মানবতা বিরোধী কাজ করেছে বাইডেন প্রশাসন।

সেনেটর বার্নি স্যানডার্স এবং বেশ কয়েক জন আমেরিকান সেনেটর মার্কিন কংগ্রেসের কাছে এক আবেদন পত্রে জানিয়েছেন, প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে আফগানিস্তান এক ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা না হলে কয়েক লক্ষ আফগানবাসীর মৃত্যুর জন্য আমেরিকা দায়ী থাকবে।

বাইডেন প্রশাসনের আশা, আফগানিস্তানকে আর্থিক বিপাকে ফেলে তালিবানদের সঙ্গে জনগণের মধ্যে সৃষ্ট বিভেদ আখেরে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করবে।

অবশ্য মার্কিন প্রশাসনের এমন দুষ্কর্ম নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিউবা, ভেনেজুয়েলা, সিরিয়া এবং অন্যান্য বহু দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা একই নীতি অনুসরণ করে এসেছে এবং রাশিয়া সম্ভবত এমন অপকর্মের আধুনিকতম সংস্করণ।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ ২০২২

তৃণাঞ্জন চক্রবর্তী

নিও-লিবারাল রাজনীতি বা মুক্ত বাজার অর্থনীতি যতই অপছন্দের হোক, ফ্রান্স বা পশ্চিম দুনিয়ার মানুষ এখনও তার কোনো সুষ্ঠু রাজনৈতিক বিকল্প চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না। আপাতত একে স্বতঃসিদ্ধ বলে মানা ছাড়া কোনো পথ নেই। কারণ বাম সোশ্যাল-ডেমক্র্যাট মডেল শুধু ফ্রান্স নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও মুখ থুবড়ে পড়ছে। সেই শূন্যস্থান ভরাট করছে অতি বাম ও অতি ডান শক্তি। এবার নির্বাচনে সেই ঝোঁক স্পষ্ট। এ বার দেখা গেল রাজনীতিকে, প্রথাগত দলের বদলে, প্রথা বিরোধী রাজনৈতিক উদ্যোগ বা ব্লকের আলম্ব-নির্ভর হয়ে পড়তে। প্রথম রাউন্ডেই এই তিনটি ব্লক সামনের সারিতে উঠে এসেছিল, প্রথম ধারাটি অতি-বাম ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনপন্থী, যার মুখ জঁ লুক মেলঁশোঁ, দ্বিতীয়টি মধ্যপন্থী ও ইউরোপ-পন্থী, যার মুখ মাকরঁ। তৃতীয়টি উগ্র-জাতীয়তাবাদী ইউরোপ-বিরোধী, মুখ মারিন ল্য পেন।

অতিবাম প্রার্থী জঁ-লুক মেলঁশোঁ ২০০৮-এর আন্দাজ করতে পেরেছিলেন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের পতন। কারণ তিনি —বর্ষীয়ান একজন সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্য—ভেতর থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন এই রাজনীতির অপ্রাসঙ্গিকতা। নিজের পার্টিতে তিনি চিরকাল নিয়েছেন কট্টর বামপন্থী লাইন। অতএব নিজের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করলেন, তাতে প্রথমেই দাবি তুললেন পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল-পরিবর্তন। বললেন, গণতন্ত্রের নামে এখন যেটা চলছে, তা হল রাষ্ট্রপতি-তন্ত্র। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের থেকে খুব একটা তফাৎ নেই এর। চাই প্রকৃত গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন। ২০০৮-এর অর্থনৈতিক সংকটের আবহে এই বাম রাজনৈতিক বয়ান মান্যতা পেল। সমগ্র বামশক্তির অগ্রভাগে চলে এলেন মেলঁশোঁ।

সংকটের সাতকাহন

২০১৯-এর এক সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ফ্রান্সে দারিদ্র্য-সীমার নীচে বসবাস করেন প্রায় এক কোটি, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার কমবেশি ১৫ শতাংশ মানুষ। প্রায় ৩৬ লাখ লোক বেঘর, মাথার ওপর ছাদ নেই, নেই খাদ্যের নিশ্চয়তা। বেকারের সংখ্যা ২০২১ থেকে নিম্নগামী হলেও চাকরি খোয়ানোর ভয় তাড়া করে বেড়াচ্ছে অবিরত সব ফরাসিকে। কাজের সঙ্গে কর্মীর আত্মমর্যাদা, আত্মপরিচয়ের অনুষঙ্গ ক্রমাগত ক্ষীণ হচ্ছে, ক্রমশ জোরদার হচ্ছে নেতিবাচক নিরাপত্তার অনুষঙ্গ। বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ফ্রান্সে অর্থনীতি শুধু উৎপাদনমুখী ছিল না, তার মধ্যে ছিল এক সামাজিক দায়বদ্ধতাও—শ্রমিকের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার অঙ্গীকার। সত্তরের দশকে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কায় এই দায়বদ্ধতার ভাঁড়ারে টান পড়া শুরু হল। কলকারখানা বন্ধ, বেকারত্ব আকাশ-ছোঁয়া— চাকরিকে যেন তেন প্রকারেণ টিকিয়ে রাখতে না পারলে নির্বাসিত হতে হবে সমাজের অন্তেবাসীর দলে—এই ভয়ের সেই শুরু। বহিষ্করণের এই ভয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাগামছাড়া হল কাজের চাপ, তজ্জনিত রোগ ও দুর্ভোগ।

শিল্পায়িত ফ্রান্সের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ এখন বি-শিল্পায়ন। বিগত শতকের নয়ের দশক থেকে, বিশ্বায়ন ফ্রান্সের অর্থনীতিতে বিশেষ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেনি। ২০১২ সালের একটা হিসেব বলছে ২০০৪ থেকে ২০১২, বিগত আট বছরে ফ্রান্সে সাড়ে-চার লক্ষ মানুষ চাকরি খুইয়েছে। এর বড় কারণ, শ্রমের খরচ বাঁচাতে ফ্রান্সের চৌহদ্দি ছেড়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের উদ্দেশ্যে উৎপাদন-শিল্পের নিষ্ক্রমণ। এবং এর নিদান হিসেবে রাষ্ট্রপতি মাকরঁ এক আশ্চর্যজনক পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিলেন। অর্থাৎ তা একাধারে শ্রমিক-স্বার্থপন্থী এবং শ্রমিক বিরোধী। শ্রমিক স্বার্থপন্থী, কারণ, এতে বেকারির নিদান আছে, শ্রমিক বিরোধী, কারণ এতে শ্রমিকের অধিকার সংকোচনের যথেষ্ট সুযোগ আছে।

ফ্রান্সের কৃষিক্ষেত্রে গড়ে দুই দিন অন্তর একজন কৃষক আত্মহত্যা করছেন। শ্রম, বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমেত কৃষি বা পশুপালনের খরচ এতটাই বেলাগাম যে কৃষকের পেট ভরা দূরস্থান, ঋণভারে জর্জরিত অবস্থা। এ দিকে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার কৃষকদের সঙ্গে পাল্লা দিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের ওপর মারতে হচ্ছে কোপ।

শুধু শ্রমিক বা কৃষক নয়, মধ্যবিত্ত জীবনের ওপরও নেমে এসেছে খাঁড়ার ঘা—বিশেষত ছোট শহর বা শহরতলির বাসিন্দা যাঁরা। মজার কথা হল ফ্রান্সে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞায় অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দেখা হত এক দিকে ধনিক শ্রেণি অপর দিকে শ্রমিকদের মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে। অর্থাৎ নির্ণয়ের মানদণ্ডটি ছিল অর্থনৈতিক। এখন শহরতলির মধ্যবিত্ত ধরা হয় তাঁদের, যাঁরা বসবাস করেন অভিবাসী-অধ্যুষিত পল্লির চৌহদ্দির বাইরে, যাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছোটখাটো বাড়ির মালিক আর যাঁদের গায়ের রং প্রধানত সাদা। অর্থাৎ, মানদণ্ডটি হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটাই জাতিসত্তা-ভিত্তিক। শিল্পায়নের স্বর্ণযুগে এই সব শহরতলিতে গ্রাম থেকে এসে মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন চাকরির আশায়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের শিল্পবিপ্লবের যুগে, বিশেষত মহাযুদ্ধ-পরবর্তী শিল্প উৎপাদনের তিন স্বর্ণদশক জুড়ে এগুলিই হয়ে উঠেছিল সচ্ছল শিল্প-উৎপাদনকেন্দ্র। ১৯৮০ দশকের থেকে উপেক্ষিত হতে হতে তাঁরাই ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়লেন। ফ্রান্সের মাটিতে ফাটল ধরল, এক দেশের মধ্যে যেন জন্ম নিল আলাদা দু'টি দেশ; জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ নিয়ে বিশ্বায়নের প্রসাদ-পুষ্ট মহানগর-ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ফ্রান্স এবং ৬০ শতাংশ নিয়ে গ্রাম-শহরতলির প্রান্তিক ফ্রান্স।

সংখ্যাগুরু প্রান্তিক ফ্রান্স যেমন নিজেকে গুটিয়ে ঢুকে পড়ে জাতিসত্তার খোলসের মধ্যে, তেমনি সংখ্যালঘু ও বিশ্বায়িত মহানাগরিক কেন্দ্রীয় ফ্রান্স নিজেকে আরো প্রসারিত করে, রাষ্ট্রপতি মাকরঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে উর্ধে তুলে ধরতে চায় সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে। নিন্দুকেরা অবশ্য বলেন মাকরঁ এই বহুত্ববাদী তত্ত্বের আড়ালে আসলে মান্যতা দিতে চান ফ্রান্সের ওপর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের খবরদারিকে। আর তার কাছে মাথা নুইয়ে ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতারা পৌর পরিষেবার সংকোচ ঘটান, জিনিসপত্র, পরিষেবা বা সম্পত্তির ওপর অন্যায্য সব কর চাপিয়ে দেন, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অবলুপ্তির পরিকল্পনা করেন, শ্রমিক-কর্মচারীর অধিকার খর্ব করেন।

অন্য দিকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে ক্ষয়িষ্ণু ও বিশ্বায়ন-উপেক্ষিত ফরাসির আশা-ভরসার স্থল হয়ে উঠছেন যেন দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদী দল ও তাঁদের নেত্রী মারিন ল্য পেন। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বৃহদংশ নিয়ে নিম্নগামী লিফটে সওয়ারি প্রান্তিক ফ্রান্সের গায়ের রঙ প্রধানত সাদা। অতএব, এই শ্বেতাঙ্গ ফ্রান্সকে অনেকাংশে বোঝানো গেছে, যত নষ্টের গোড়া ওই কালো ও বাদামি অভিবাসীরা।

আসলে, শ্রমের পক্ষে বাম এবং পুঁজির পক্ষে দক্ষিণ—বাম ও দক্ষিণের এই প্রথাগত বিভেদ বা দ্বন্দ্বের জায়গাটা বেশ কয়েক দশক যাবৎ ঝাপসা হয়ে গেছে। সেই আশির দশকেই বামপন্থী ফরাসি রাষ্ট্রপতি ফ্রঁসোয়া মিতেরঁ, দক্ষিণপন্থী ব্রিটিশ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগানের মধ্যে মুক্ত বাজার-অর্থনীতি নিয়ে কোনো মূলগত বিভেদ ছিল না। ফ্রান্সে ফাটকা-বাজার অর্থনীতির প্রবর্তক স্বয়ং মিতেরঁ-সাহেব।

অনেকে বলেন, ফ্রান্সে-শ্রেণি নাকি প্রায় একটি বিলুপ্ত প্রজাতি। কারণ শিল্প এখন যতটা না শ্রম-নিবিড়, তার থেকে অনেক বেশি পুঁজি-নিবিড়। এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে শ্রমিক প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই কমছে। এইটি অর্ধ সত্য। এটা ঠিক, শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। কিন্তু তার কারণটা অন্য। পুঁজির বিদেশে পলায়ন। সুতরাং শ্রমিকবাহিনীর সিংহভাগ গরীব দেশগুলোয়, যেখানে শ্রম অনেক সস্তা ও তার যোগান অঢেল। বিশ্বায়নের ফলে আরেকটা ঘটনা ঘটল। বিশাল একেকটা উৎপাদন কেন্দ্র টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে গেল বিশ্বব্যাপী। পুরনো (প্রাক-বিশ্বায়ন) জমানায় তো উৎপাদন কেন্দ্রগুলো সংহত ছিল, কারখানার একটা গেটে হাজার হাজার শ্রমিকের দেখা পাওয়া, তাদের সংগঠিত করা সম্ভব হত। নতুন জমানায় শ্রমিককে এক জায়গায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হল। বাম সংগঠনের ক্ষয়প্রাপ্তির একটি সম্ভাব্য কারণ অবশ্যই উৎপাদন-সম্পর্কের এই চরিত্র বদল। উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় পরিবর্তন উৎপাদন-ক্ষেত্রের ক্ষয় ও পরিষেবা-ক্ষেত্রের বৃদ্ধি। শুধু ফ্রান্স কেন, সারা বিশ্বব্যাপী এই চরিত্র-পরিবর্তনের সঙ্গে এখনো সেভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারেননি বামপন্থীরা।

সেইজন্য আর সংগঠিত পার্টি নয়। নির্বাচনে প্রথম তিন বিজেতার পেছনে সক্রিয় থেকেছে বরং এক ধরনের গণ-উদ্যোগ। অনেকটা আধুনিক শিল্পোদ্যোগের মতো সংগঠন যার কোনো সভ্য নেই। মিছিলে পা মেলানো বা অন্য কোনো আন্দোলনের সময়ে সামাজিক মাধ্যমে আন্দোলনের ডাক, সহমত নির্মাণ, তর্কবিতর্ক। ধরনটা অনেকটা মাল্টিলেভেল মার্কেটিং মডেলের মতো বা উবের কোম্পানির মতো। নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হচ্ছে এই গণ-উদ্যোগ, অন্তত প্রবক্তাদের তেমনটাই দাবি।

বিগত কয়েক বছর, ফ্রান্সের নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ইউরোপের প্রসঙ্গটি। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে গেলে একটু পেছনের দিকে মুখ ফেরাতে হবে।

উনিশ শতকের উপনিবেশ বিস্তারকে যদি আমরা প্রথম ভুবনায়ন হিসেবে চিহ্নিত করি তো তার বৈশিষ্ট্য ছিল কাঁচামালের বিনিময়ে উপনিবেশগুলিতে ইউরোপে প্রস্তুত পণ্যের যোগান।

১৯৬২-তে প্রযুক্তি নির্ভর উচ্চফলনশীল কৃষির উদ্বৃত্ত ক্রেতার হাতে পৌঁছে দিতে সীমান্তের বেড়া ভেঙে দেওয়া হল। সারা ইউরোপ জুড়ে তৈরি হল কৃষিপণ্যের খোলা বাজার। ১৯৭৩-এর ঊর্ধ্বমুখী পেট্রো-মূল্যের ধাক্কায় ধরাশায়ী ফ্রান্স আঁকড়ে ধরল এক নব্য ভুবনায়ন। মুক্ত বাজারনীতি তার ভরকেন্দ্র। কৃষিবিজ্ঞানী রনে দ্যুমোঁর কলমে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে পরিবেশ চিন্তা স্বীকৃত হল। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই ভুবনায়নের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে, আর কাঁচামাল নয়, শুধু শিল্পপণ্যের বিনিময়। অর্থাৎ ফ্রান্সের পজো গাড়ি যেমন ইয়োরোপের অন্য দেশে বিকোচ্ছে, ফ্রান্সেও তেমনি বিক্রি হচ্ছে জার্মান বা ইতালির গাড়ি।

১৯৮২ থেকে ফ্রান্সের তখতে সমাজবাদী ফ্রঁসোয়া মিতেরঁ। তাঁর আমলেই প্রথম আধুনিকীকরণ হল ফ্রান্সের অর্থনীতির, সুসংগঠিত হল বিশ্বায়িত আর্থিক বাজার। ১৯৮৯-এ বার্লিন-প্রাচীরের পতন। পূর্ব ইউরোপ, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলির মতো মার্ক্সবাদের সাবেক দুর্গে মিশেল ফুকোর মরোত্তর গ্রন্থ 'যৌনতার ইতিহাস' বাস্তুচ্যুত করল 'দাস ক্যাপিটাল'কে। ফুকোর চিন্তায় কোনো সার্বজনীন লক্ষ্যস্থলের বালাই নেই, আছে শুধু মারাত্মক এক স্থিতিস্থাপকতা। অনেকটা হাতিয়ারের মতো—ফুকোর এই 'টুলবক্স'। মহা-আখ্যানের 'গ্লাসনস্ত' বলা যায় একে? বা খুদে-আখ্যানের বিশ্বায়ন? তৃতীয় এই বিশ্বায়নে আর পণ্যের আমদানি বা যোগান নয়, বিশ্বের কোণে কোণে সতী দেহের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সারা বিশ্ব থেকে যন্ত্রাংশ এনে, জড়ো করে বানানো হল পুতুল, ফোন বা এরোপ্লেন। এই উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করতে প্রয়োজন হল আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার।

প্রায় দুশো বছর ধরে যে চিত্রনাট্য তিলে তিলে লেখা হচ্ছিল তা যেন অন্তিম ক্লাইম্যাক্সে এসে পৌঁছল ১৯৯২-এ। হল্যান্ডের মাস্ট্রিচে যে চুক্তিপত্রে সিলমোহর পড়ল তার থেকে জন্ম নিল 'ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন'। কোনো বিপুল ভূখণ্ডের রূপে নয়, তা বাস্তবায়িত হল ক্ষুদ্র মুদ্রার রূপ ধরে। ২০০২-এ ছড়িয়ে পড়ল ক্রেতার পকেটে পকেটে। বিশ্বায়ন কি আসলে ক্ষুদ্রায়ণ?

এই বিশ্বায়ন বা ইউরোপীয়নে জনসাধারণ কতখানি উপকৃত হলেন? ফ্রান্সের শিল্পোদ্যোগ তো বটেই, যেসব মার্কিন বা বহুজাতিক সংস্থা ফ্রান্সে জমিয়ে বসেছিল অচিরেই পাট গুটিয়ে পালালো ইউরোপের অন্যান্য সস্তা শ্রমের দেশে। অর্থনীতিতে রক্তক্ষরণ শুরু হল, যার পোশাকি নাম, আমরা আগেই বলেছি, বি-শিল্পায়ন। খণ্ডিত উৎপাদন-প্রক্রিয়ার তালে তাল মেলালো খণ্ডিত শ্রম, খণ্ডিত জীবিকা, জীবন। সকাল থেকে সন্ধ্যা, যৌবন থেকে জীবন-সায়াহ্ন- নিরবচ্ছিন্ন শ্রমজীবনের দিন শেষ। বিগত সেই আস্ত বেতনের যুগ।

উপসংহার

মাকরঁ পুনর্নির্বাচিত হলেন বটে, কিন্তু ২০১৭-র ফলাফলের তুলনায় ২০২২-এর ফলকে বিচার করে বরং গভীর উদ্বেগের কারণ থেকে যাচ্ছে। কারণ, ২০১৭-র তুলনায় অতি-দক্ষিণপন্থীদের ভোট বেড়েছে প্রায় ৮ শতাংশ। ভোটদানে বিমুখ মানুষের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৩ শতাংশ। তার মানে অবশ্যই রাষ্ট্র-পরিচালনায়

এরপর ৬ পাতায়

ময়ূরাক্ষীর তীরে আলু চাষ

(১০ আশ্বিন থেকে ১০ পৌষ)

প্রমথেশ মুখার্জী

মাঠে এখন আর আলু নেই, আলু চলে গিয়েছে হিমঘরে, আরো লাভের জন্য। আর কিছুটা ব্যক্তিগত হেপাজতে খাবার জন্য, পরের বারের বীজ সংরক্ষণের জন্য। গড়পড়তা সাধারণ চাষীর হাতে আলু এই সময় থাকে না। ব্যাঙ্ক-মহাজন-বড় দোকানীর দেনা পরিশোধ করে হাতে আর কিছু থাকে না। আলু তোলার সময় আশা ছিল ছেলেমেয়ের জন্য শীতের জামা-চাদর-লেপ করাবে, বাড়ীর বুড়োটার জন্য শহরে গিয়ে চিকিৎসা করাবে। শেষ পর্যন্ত সে-সব আর ঠিক ঠিক হয়ে উঠলোনা। মনের আশা মনেই চাপা রইল।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ক্লান্ত চাষী আবার আলুর জমিতে যায়। জমিতে আলুর ভিলিতে খেঁড়ো-কাঁকুর- কুমড়োর বীজ বসানো ছিল সেগুলো মাথা তুলে বড় হচ্ছে। আবার কাস্তে চালায়, খেঁড়ো-কাঁকুর-কুমড়োর চারাগুলোকে বড় হতে সাহায্য করে, শিশু চারাগুলোকে যতনে সাজায়। সেগুলো যখন লক্‌লক্‌ করে ওঠে তখন আবার নতুন আশায় চাষী বুক বাঁধে।

শ্রাবণের অবিরাম বারিধারা, ময়ূরাক্ষীর বাঁধ-ভাঙা জল—প্লাবনের ফলে মাটিতে পলি জমে, তার সাথে আলু চাষে ব্যবহৃত সার—সালফেট-গোবর-ফার্টিলাইজার পলি মাটির সাথে মিশে উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে। আর এই খেতের ওপর চাষীর শ্রম ও যত্নে ৩০-৩৫ কেজি ওজনের কুমড়ো, চোখ ধাঁধানো মূলো, সুদৃশ্য খেঁড়ো- কাঁকুড়-শশা, করলা হতদরিদ্র চাষীকে আনন্দে মাতিয়ে তোলে। আধুনিক পদ্ধতিতে তারা চাষ করে কিন্তু ফসলের গায়ে কেমিক্যাল (বিষ) মিশিয়ে ফসলগুলোকে স্ফীত করে না বা চকচকে করে না। এই সব ফসলে শহরের কৃষি-প্রদর্শনী ঝলমল করে। ফাঁকিবাজ সরকারের বিজ্ঞাপনে তারা ঠাঁই করে নেয়।

নিম্ন-ময়ূরাক্ষী উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নিমা বাহাদুরপুরের ডাকবাংলা হাট-ময়দান। এর চারপাশে প্রভূত ধান উৎপন্ন হয়। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ, মিনি ডিপ ইত্যাদি সেচের সরকারী সুযোগ সম্প্রসারিত হয়। ধানের উৎপাদন বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আনিন্দ রাইস মিল এবং আরো ৩।৪টি রাইস মিল গড়ে ওঠে। পাঞ্জাব-উত্তরপ্রদেশ-বিহারের নয়নভোলানো আলুর চাষ দেখে ময়ূরাক্ষীর তীর বরাবর উচ্চ ফলনশীল আলুর চাষ হতে থাকে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। ''সমবায়িকা'' হিমঘর, তারপর 'আফ্রিকা' হিমঘর মানুষের আস্থা-ভরসা সৃষ্টি করে।

''খাজাবাবা'' হিমঘর একালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ময়ূরাক্ষী নদীর তীর ধরে সোজা পশ্চিম দিকে সাঁইথিয়া ব্রীজের তল দিয়ে প্যাটেল নগর পর্যন্ত বহু দৃষ্টিনন্দন হিমঘর গড়ে ওঠে। রামনগরে হরিপদ হিমঘর, কোটাসপুর, সাঁইথিয়ায়, একের পর এক ষাটপলসা গোডাউন এবং লোকপাড়ায় ময়ূরাক্ষী হিমঘর গড়ে ওঠে। ডাকবাংলার হাট এবং সাঁইথিয়া বাজার থেকে আলু সংগ্রহ করে দুর্গাপুর-আসানসোল এবং পশ্চিমের বাজারের চাহিদা পূরণ হয়। সরকারি নিয়মের সুযোগ সুবিধা থাকলে বাংলা দেশের সীমানা বরাবর এই আলু ব্যাপক চালান যায়। সরকারি উদ্যোগে কো-অপারেটিভ হিমঘরের ব্যবসা-বাণিজ্য চালু থাকলেও তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে খাগড়া- জিয়াগঞ্জ-জঙ্গীপুরের খ্যাতিমান ব্যবসাদাররা কোটি কোটি টাকা আয় করে। বর্গাচাষী-প্রান্তিক চাষী-দরিদ্র চাষী কোন লাভ পায় না। এমন কি খাবার জন্য বা পরবর্তীকালের জন্য যেসব চাষী হিমঘরে আলু রাখে তারাও হিমঘরের নানা ছলচাতুরিতে বিপর্যস্ত হয়ে ফিরে আসে। বাজার-ব্যবস্থার একটা যাদু আছে যেটা ধনিক শ্রেণি ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে কাজ করে। কখনও তা নিম্ন আয়ের, মানুষ বা নীচুতলার মানুষের পক্ষে থাকে না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতি-নির্ণায়ক শক্তি সব সময় কর্পোরেট হাউসের পক্ষে থাকে, কখনও নীচু তলার চাষী বা ব্যবসায়ীর পক্ষে থাকে না।

আজকের সংঘাতমূলক বাজার ব্যবস্থায় একটা নতুন লক্ষণ (দ্বন্দ্ব) দেখা দিয়েছে। ময়নাগুড়ি-ধূপগুড়ি এলাকায় আলুর ব্যাপক প্রোডাকসন্ হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের চূড়া থেকে মুর্শিদাবাদ—(বীরভূমের) রামপুরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এই আলু তার বাজার ধরে নিয়েছে। এটাই হচ্ছে ধূপগুড়ি ভ্যারাইটি। অপরদিকে, নিমাবাহাদুরপুরের ডাকবাংলা হাট থেকে ময়ূরাক্ষীর দুই তীরে বর্ধমান ভ্যারাইটি প্রোডাকশনস এবং হুগলী প্রোডাকসন্‌স যুগ্মভাবে বর্ধমান ভ্যারাইটি তৈরী করেছে। বর্ধমান থেকে কোলকাতা এবং সারা মধ্যবঙ্গে ছড়িয়ে আছে বর্ধমান ভ্যারাইটি। এবারের জুলাই-আগস্ট থেকে এই দুই ভ্যারাইটির মুখোমুখি দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়বে। ফলে বাজারে যে সংকটের সৃষ্টি হবে তার আগুনের ছোঁয়া লাগবে সাধারণ চাষীকে যারা অতি কষ্টে হিমঘরে আলু রেখেছেন।

অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, চার বিঘা জায়গায় সাধারণভাবে চাষীর চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়। কিন্তু এবারে সারা রাজ্যের সমস্ত হিমঘরে (৮০ শতাংশ) শতকরা আশি ভাগ ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এটা মে-জুনের বাজার। এরপর জুলাই-আগস্ট বাজার হুমরি খেয়ে পড়বে। সাধারণ চাহিদার অতিরিক্ত বেশি পরিমাণে হিমঘর থেকে আলু বেরিয়ে আসবে। ক্রেতার চাহিদা সে পরিমাণ থাকবেনা। সেই সংকট কাটাতে সরকার বা কর্পোরেট হাউস এগিয়ে আসবে না। হু হু করে বাজারের দাম পড়ে যাবে। একসঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলু বাজারজাত হওয়ার ফলে দাম পড়ে যাবে। গরিব চাষী মার খাবে। তার লোকসান সামাল দিতে না পারলে রাস্তার ধারে স্তূপাকার আলুর বস্তায় পচন ধরবে। পচা আলু শহরের, হোটেলে চলবে না। ভরপুর বর্ষার সময় থেকে পুজোর মুখ পর্যন্ত পচা আলুর দাপট অব্যাহত থাকবে। গরিব চাষী এবং সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই সময় বর্ধমান-দুর্গাপুর- রানীগঞ্জ-আসানসোল এলাকায় মেন সবজির জায়গা নেয় 'কচু'। কচুর কদর বেড়ে যায়। কচুর সঙ্গে পাকা কুমড়োর চাহিদা বাড়ে।

একটা ভিন্ন ভ্যারাইটির পাকা আলু আছে যা এত সহজে পচে না। পুজোর মুখে, উৎসবের দিনে অন্যান্য ভোজে—কাজে অনুষ্ঠানে সেই আলুর চাহিদা বেড়ে যায়। সেটা উন্নতমানের সংরক্ষণশীল ধনী চাষীরা করায়ত্ত করে রাখে। মোদ্দা কথা ধনী চাষীরা, বিনিয়োগের ক্ষমতা আছে যাদের বেশি, তারাই আলু চাষে লাভবান হয়। ময়ূরাক্ষী তীরের চাষীরা সুন্দরী আলু বোঝাই উঁচু উঁচু ট্রাকের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা সময় ছিল যখন ময়ূরাক্ষীর ঢেউ-এর মাথায় বড় বড় পালতোলা নৌকা ছুটতো। বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদ—এই তিন জেলার সীমানা যে জায়গায় মিলিত হয়েছে তার নাম ''বিল লাঙল হাটা''। লাভপুরের গা লাগা জায়গা।

এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছাড়া কিছু দেখা যায় না, শুধু জল আর জল। এই বিল লাঙল হাটায় ছোট-বড় নানা ধরনের মাছ উৎপন্ন হয়। বর্ধমান স্টেশন থেকে সাঁইথিয়া স্টেশন হয়ে খাগড়া স্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত ত্রিভুজাকৃতি এলাকায় মাছের চাহিদা মিটিয়ে দেয় এই বিল লাঙলহাটা। তার পলিমিশ্রিত মাটিতে, কোপাই (কুয়ে) নদী—ময়ূরাক্ষী নদী, ডাউকি (এবং ভাগীরথীর) ছোট ছোট শাখা নদী হয়ে বিস্তৃত জলাভূমিতে যে পলি জমিতে পড়ে তাতে রাশি রাশি আলু- আখ-কুমড়ো-করলা এবং আরো কত ফসল এখানে জন্মায়। সাধারণ মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মিটে যায়।

বিস্তৃত ফেনিল জলরাশির একপ্রান্তে ''বিল লাঙল হাটা' আর অপর প্রান্তে 'হিজল বিল'। এই দুই বিলের বিপুলা জলরাশি স্থানীয়ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মাছ জোগায়, জল কমে গেলে আলু আর অফুরন্ত উচ্চফলনশীল ধান জোগায়। এই ধানকে কেন্দ্র লাঙলহাটা বিলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে টালি-দেওয়া টিন-পেটানো ঘর বাড়ি তৈরি হয়। স্রোতের নিচু এলাকায় ভরতপুরের আঙারপুরের ঘাট থেকে ভাগীরথীর স্রোতধারায় মিলনস্থল পর্যন্ত কত প্রাসাদ ও সাম্রাজ্যের দালান বাড়ি, জমিদারি বৈঠকখানা (কান্দি রাজবাড়ি, জেলা রাজবাড়ি। বহড়ার ত্রিবেদীর বাড়ি) তৈরি হয়েছে কে তার হিসাব রাখে।

এই সময় তারাশঙ্করের মতো সাহিত্যিক থাকলে বিপুলা এই জলরাশির উচ্ছলতা-দ্বন্দ্ব-সংঘাত — মানবজীবনে তার অবদান, প্রেম- নাটকীয়তা-মাধুর্য যবে মিলে উন্নতকালের উপন্যাস তৈরি হয়ে যেত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় প্রখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ নৌকাযোগে ভাগীরথীর জলপথে কর্ণসুবর্ণ হয়ে হিজল এবং পাঁচথুপী বারকোনা মন্দিরের পাদদেশ পর্যন্ত চলে আসেন। ময়ূরাক্ষী নদীর দু'ধারে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটে এবং তার বিবরণ থেকে পাওয়া যায় বড় বড় নৌকার ওপর বসবাসকারী গ্রামীণ হতদরিদ্র শ্রমজীবি মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনী। বহুকাল ধরে হতদরিদ্র কৃষিজীবি মানুষের জীবন-সংগ্রামের ঘর ঘরকা কাহিনী যা চলে আসছে তার অন্যতম এক দাতা হচ্ছে এই এলাকার আলু চাষ।

৫-এর পাতার পর

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

রাষ্ট্রনায়কের কিছু খামতি ছিল, যার ফায়দা তুলেছে ল্য পেন-সম্প্রদায়। বস্তুত তাঁর রাষ্ট্রনেতৃত্বের পঞ্চবার্ষিকী বারবার ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে অপব্যবহারের অভিযোগ উঠল বেনাল্লা- কেলেঙ্কারিতে। নিন্দুকেরা মাকরঁ-রাজকে এক নয়া-উদ্ভাবিত শিরোপায় ভূষিত করলেন—গণ একনায়কতন্ত্র বা আধা-একনায়কতন্ত্র।

দেশের সামাজিক ক্ষেত্র উত্তাল হয়ে উঠল হলুদ-জ্যাকেট আন্দোলনে। ২০১৭-এ মাকরঁর আবির্ভাব এমন এক আকাশছোঁয়া প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল যার প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হল এই রাজনৈতিক সুনামি। তারপর এল শরণার্থীর ঢেউ। অতি-দক্ষিণবাদীরা হাতে ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক রাজনীতির নতুন ইন্ধন পেলেন। অবসরের বয়সে সংস্কার আনতে গিয়েও হাত পোড়ালেন রাষ্ট্রনেতা। ইতিমধ্যে আছড়ে পড়ল অতিমারির ঢেউ। নগ্ন করে দিল স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা। সীমানা-ভাঙা বিশ্বায়িত মানুষ কুঁকড়ে আবার ঢুকে গেল নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে। 'বাঁচতে হলে নিজেকে সীমানায় বাঁধো'— অনুচ্চারিত এমন কোনো মাকরঁ-বিরোধী শ্লোগান যেন এই সুযোগে আরো ন্যায্যতা পেল। সেই ঢেউ সরে যাওয়ার পর অর্থনীতি যখন সদ্য আবার একটু সীমানা অতিক্রমের চেষ্টা করছে, এসে পড়ল ইউক্রেনে রুশ-আগ্রাসন। নির্বাচনে মাকরঁর যদি প্রকৃত প্রতিপক্ষ কেউ থেকে থাকে, তা উল্লিখিত এই সমস্যাগুলি আশার কথা দেরিতে হলেও, মাকরঁ নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। নির্বাচনে জয়লাভের পর অতি সংবৃত এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, ''যাঁরা আমায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন, তাঁদের অনেকেই আমার মতাদর্শেরে পক্ষে নন, তাঁরা আমায় ভোট দিয়েছেন অতি-দক্ষিণপন্থার পথরোধ করতে''। তিনি জানেন তাঁর এই জয়লাভের পেছনে বহুলাংশে বামপন্থী ভোটের সক্রিয় মদত রয়েছে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বদীর্ণ ফ্রান্সে তাঁর কাজ হবে দলমত নির্বিশেষে সকলের চাহিদা ও অনুভূতিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া। আগামী দিনে তিনি নিশ্চিত করবেন কেউ যাতে আর উপেক্ষিত বোধ না করেন। ''যে নতুন যুগ শুরু হতে চলেছে তা বিগত জমানার ধারাবাহিকতা হবে না''। অর্থাৎ উল্লাসের দিন নয়, সামনে অনেক লড়াই অপেক্ষা করছে। শুধু স্বদেশে নয়, সারা বিশ্বেই এখন এমন অনেক চিতার আগুন জ্বলছে। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁকে শান্তি ও ঐক্যের বার্তাবাহক হয়ে উঠতে হবে।

লড়াইয়ের প্রথম পর্ব আসন্ন লোকসভা নির্বাচন। যে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি তো বটেই, তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীও নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের রেশ ফোরাবার আগেই লোকসভার দামামা বেজে উঠল। এই ঢাকে প্রথম কাঠির বাড়ি অবশ্য পড়েছিল প্রথম রাউন্ডের ফল ঘোষণার পরক্ষণেই। তিন নম্বরে থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডের রেস থেকে ছিটকে যাওয়া জঁ লুক মেলাঁশোঁ বললেন, তিনি রেসেই আছেন, মোটেই ছিটকে যাননি। ফরাসি জাতির কাছে সোচ্চারে আবেদন রাখলেন, তাঁর দলকে জয়যুক্ত করে তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করা হোক। তিনি ডাক দিলেন রাজনৈতিক সহাবস্থানের। যেমনটা পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের ইতহাসে তিনবার হয়েছিল। প্রথম দুবার রাষ্ট্রপতি ফ্রঁসোয়া মিতেরঁর আমলে, ১৯৮৬-৮৮; সহাবস্থান হয়েছিল দক্ষিণপন্থী জ্যাক শিরাক নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে, দ্বিতীয় বার ১৯৯৩-৯৫; এদুয়ার বালাদুর পরিচালিত সরকারের সঙ্গে। তৃতীয় সহাবস্থানের নজির তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রপতি জাক শিরাকের আমলে, তাঁকে সহাবস্থান করতে হয়েছিল লিয়োনেল জোসপ্যাঁ নেতৃত্বাধীন বামপন্থী সরকারের সঙ্গে। এবার কী হতে চলেছে?

কলকাতায় আর ওয়াই এফ-এর চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন কম. মনোজ ভট্টাচার্য

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

গত ১০-১১ মে, ২০২২ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও গণ-আন্দোলনের অন্যতম মহানগর কলকাতার কমরেড জি প্রিয়দেব মঞ্চ, লোকায়ত সভাগৃহে (ক্রান্তি প্রেস) আর ওয়াই এফ-এর চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ১২টি রাজ্যের দেড়শত যুবক-যুবতী এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের প্রারম্ভে সংগঠনের জাতীয় কমিটির সভাপতি কম. আর এস ডাগর বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, শান্তি চিহ্নিত রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। আর ওয়াই এফ-এর প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা আর এস পি-র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও লোকসভার সাংসদ কম. এন কে প্রেমচন্দ্রন, আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কম. বিশ্বনাথ চৌধুরী, আর ওয়াই এফ-এর প্রাক্তন নেতৃত্ব কম. শিবু বেবী জন ও সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কম. অঞ্জনাভ দত্ত সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের আর এস পি ও আর ওয়াই এফ-এর নেতৃবৃন্দ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনের কাজ পরিচালনার জন্য কম. আর এস ডাগর, কম. রাহুল মুখার্জী, কম. শিবু কোরানীকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আর এস পি সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। কম. ভট্টাচার্য তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বর্তমান সময়ে বিজেপি ও আর এস এস কিভাবে দেশের সংবিধানে স্বীকৃত বেঁচে থাকার অধিকারকে যেভাবে অবজ্ঞা করছে তার তীব্র সমালোচনা করেন। পাশাপাশি আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে একান্তভাবে তাদের নিজস্ব হিন্দি - হিন্দু - হিন্দুস্থানের ভাবনাটিকে স্বৈরাচারী কায়দায় কেবলমাত্র কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষার্থে যেভাবে প্রয়োগ করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে দেশের যে যে প্রান্তে আর ওয়াই এফ-এর অস্তিত্ব রয়েছে সেই সমস্ত এলাকায় জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কম. প্রেমচন্দ্রন, কম. শিবু বেবী জন উভয়েই আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপিকে মূল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে, বর্তমানে কেন্দ্রের সরকারে আসীন বিজেপি নির্বাচনের পূর্বে মানুষের ভোট পাওয়ার জন্য যে সকল জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত না করে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হেঁটেছে। কম. প্রেমচন্দ্রন, ও কম. শিবু জন উভয়ে আরও বলেন, বিজেপি যেভাবে দেশের সম্পদ বেচে দিচ্ছে, কৃষক, শ্রমিকের স্বার্থবিরোধী নানান আইন চালু করছে, পেট্রোপণ্য, ওষুধের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে তা প্রমাণ করে দেশের বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের নয়, কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার। এই জনবিরোধী শক্তিকে ভারতবর্ষের সরকার থেকে উৎখাত করার জন্য আর ওয়াই এফকে অবিলম্বে কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান। সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কম. অঞ্জনাভ দত্ত সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনের উপর দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মোট ৩২ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

আর ওয়াই এফ-এর চতুর্থ জাতীয় সম্মেলন কম. শিবু কোরানীকে সর্বভারতীয় সভাপতি ও কম. রাজীব ব্যানার্জীকে সম্পাদক করে ৩৭ জনের জাতীয় কমিটি, ও ১৫ জনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করে।

আর ওয়াই এফ-এর চতুর্থ জাতীয় সম্মেলনকে সফল করতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাথীরা রাজ্য জুড়ে দেওয়াল লিখন, ব্যানার, ফ্লেক্স, পথসভার মাধ্যমে যেমন প্রচার আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, তেমনই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের থাকা, এবং সম্মেলন স্থল সুসজ্জিত করার যাবতীয় খরচ বাজার হাটে গিয়ে বক্স, শালুতে গণ অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে যেভাবে এই সম্মেলনকে সফল করে তুলেছে তা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

পেট্রোপণ্যসহ সমস্ত জিনিসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে

১-এর পাতার পর

উল্লেখ্য সারা দেশে মোদী সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও কর্মসূচির জন্য সমস্ত জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। আবার আমাদের রাজ্যে খেলা মেলার সরকারের চরম দুর্নীতি এবং জনবিরোধী নীতির জন্য মুদ্রাস্ফীতির হার সর্বাধিক। সুতরাং মোদী ও মমতা উভয় সরকারের বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন তীব্রতর করতে হবে।

২৫-৩১ মে পর্যন্ত ৭ দিন রাজ্যব্যাপী কর্মসূচি নিম্নরূপ

(১) **২৫ মে বুধবার**—জেলায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সর্বত্র পথসভা এবং হল্লাস্কোয়াড।

(২) **২৬ মে বৃহস্পতিবার**—জেলার বিভিন্ন বাজার এবং হাট এলাকায় পথসভা ও স্লোগানে মুখরিত করা।

(৩) **২৭ মে শুক্রবার**—সমস্ত ব্লক এলাকায় সভা অথবা স্লোগান মুখরিত মিছিল।

(৪) **২৮ মে শনিবার**—সমস্ত মহকুমা কেন্দ্রে সভা অথবা মিছিল।

(৫) **২৯ মে রবিবার**—কলকাতা বাদে সমস্ত জেলা কেন্দ্রে মিটিং অথবা স্লোগান মুখরিত বড় মিছিল।

(৬) **৩০ মে সোমবার**—সমস্ত জেলা কেন্দ্রে এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে মহকুমা ও ব্লক এলাকায় স্লোগান মুখরিত মশাল মিছিল সংগঠিত হবে।

(৭) **৩১ মে মঙ্গলবার**—কলকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে ৩ ঘণ্টার অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি।

বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা

অবস্থান-বিক্ষোভের সমাবেশে কলকাতা জেলাসহ উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার কলকাতা লাগোয়া অংশের, হাওড়া ও হুগলী জেলার কলকাতার দিকের এবং নদিয়ার রাণাঘাট মহকুমা এলাকার মানুষের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে। অবস্থান বিক্ষোভে যাঁরাই অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের রোদ এবং বৃষ্টিতে ব্যবহার করার জন্য ছাতা সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

কলকাতার কর্মসূচিতে জেলার যে সমস্ত এলাকা থেকে কমরেডরা আসবেন সেই সমস্ত এলাকা বাদ দিয়ে অন্যান্য জেলায় ৩১ মে অবস্থান বা কেন্দ্রীয়ভাব মিছিল করতে হবে।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, মুখ্যত মোদী সরকারের চরম জনস্বার্থ বিরোধী নীতির জন্য দেশের সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। রাজ্য সরকারের ভূমিকাও অবহেলার নয়। অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা এক নিদারুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। যখন কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র কতিপয় কর্পোরেট ব্যবসায়িক কোম্পানির স্বার্থ পুষ্ট করতে সদা উদ্‌গ্রীব, তখনই লক্ষ করা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রের সরকারের প্রকৃত পরিচালক আর এস এস ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে নানা ফন্দি ফিকির করে দেশের আপামর মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির অপকর্ম প্রবলবেগে বাড়িয়ে চলেছে।

অযোধ্যায় যেমন বহু সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করে পুরনো বাবরি মসজিদের সৌধ গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে রামমন্দির নির্মিত হচ্ছে। একইভাবে দেশের অন্যান্য স্থানেও নানা কুযুক্তির আশ্রয় নিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থলগুলিকে ভেঙে ফেলার উগ্র অপচেষ্টা চলছে। এমনকি, বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন তাজমহলকেও 'তেজো মহালয়' নাম দিয়ে আক্রমণের ব্যবস্থা হচ্ছে। গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে, কয়েক শত বছর আগে একটি শিবমন্দির ভেঙে ফেলে সেখানেই নাকি তাজমহল নির্মিত হয়েছিল। দিল্লির সুবিখ্যাত কুতুবমিনারকে 'বিষ্ণু স্তম্ভ' হিসেবে বহু সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচার চলছে। বেনারস বা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন জ্ঞানবাপী মসজিদের বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানিত হচ্ছে। জ্ঞানবাপী মসজিদের পুকুরে নাকি শিবলিঙ্গের অবস্থিতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মথুরাতেও একইভাবে ধর্মীয় উত্তেজনা তৈরির অদম্য অপচেষ্টা চলছে। এসব কিছুই হচ্ছে আর এস এস-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী। সংঘ পরিবারের প্রধান মোহন ভাগবৎ এই বিষ ছড়ানোর জন্য রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

লক্ষণীয়, সংঘ প্রধান মোহন ভাগবৎ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ঘাঁটি গেড়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অজস্র কথা বললেও আর এস এস-এর বিরুদ্ধে একটি শব্দও ব্যয় করেন না। এখন লক্ষ করা যাচ্ছে যে, তিনি প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন এই বিষ ছড়ানো ব্যক্তিটিকে সঠিক ভাবে দেখাশোনা করার। তাঁকে ফুল ও মিষ্টি পাঠিয়ে তিনি আপ্যায়ন করেছেন। সুতরাং তাঁর বা তৃণমূল দলের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি যে ভুয়ো তা প্রমাণিত।

Vol. 68 Issue No. 51 শনিবার ১৪ মে, ২১ মে ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

মে দিবসের সংগ্রাম আজ আর্থসামাজিক অবক্ষয় আর পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এক আশ্চর্য সময়ের মধ্যে বসবাস করছি আমরা। রাগ-অনুরাগ-বিতর্ক - প্রতর্ক... সবকিছু প্রকাশের মাধ্যমে আজ ''সামাজিক'', ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় দূরত্বও... সামাজিক। এই ''বিপুল সামাজিকতা''র চাপে সুস্থ স্বাভাবিক প্রেম-বন্ধুতার সম্পর্কগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে, এমনকি হারিয়ে যাচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের শোষিত হওয়ার বোধও। গত দুই বছরে অতিমারীর দোহাই দিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলো স্থির ব্যয় কমানো এবং উদ্বৃত্ত মূল্য নিংড়ে নেওয়ার অস্ত্র হিসাবে ''ঘর থেকে কাজ'' নামক যে নতুন ফাঁদ তৈরি করেছে, তার ফলে তথ্যপ্রযুক্তি ও অনুসারী শিল্পের কর্মীদের শ্রম দিবস এক ধাক্কায় তিন থেকে চার ঘণ্টা বেড়ে গেলো। কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম এবং সর্বোপরি কাজের পরিবেশ জোগানোর দায় খুব মসৃণভাবে কর্মীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো। মুনাফার ছিটেফোঁটা অংশ পেয়ে কর্মচারীরা তাঁদের শারীরিক-আত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে প্রতিস্থাপন করলেন আরেকটু বেশি পণ্য কেনার সামর্থ্যের বিনিময়ে। রাষ্ট্রও এই সুযোগে শ্রম আইনগুলোকে আমূল বদলে ফেলে নয়া শ্রম কোড চালু করেছে। এর ফলে শ্রমিককে আরো কম মজুরিতে বেশি খাটিয়ে নেওয়ার অধিকার পেয়েছে মালিকপক্ষ। উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে আইন করে দৈনিক ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষকে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই শ্রমিক শোষণ এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। অবৈধ খাদানের শ্রমিক ফুসফুসে ধারণ করছেন সিলিকোসিসের বিষ, মেথর-ধাঙ্গর-জমাদারের কাজ করা শ্রমিককে ন্যূনতম নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই পরিষ্কার করতে হচ্ছে দুনিয়ার জঞ্জাল, গিগ অর্থনীতির কর্মচারীদের রক্ত জল করা পরিশ্রমের উদ্বৃত্তে মুনাফার পাহাড় গড়ছে উবেরের মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম।

এই অস্থির সময়ে এক বৈপ্লবিক সম্ভাবনার সন্ধিক্ষণের সামনে দাঁড়িয়ে খোদ মার্কিন মুলুক। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আমাজনের কর্মীরা সংস্থার ২৭ বছরের ইতিহাসে প্রথম শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। নিউইয়র্ক সিটির স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের জেএফকে ৮ ওয়্যারহাউসে এই জয়ের পর প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য শাখাতেও দ্রুত ইউনিয়ন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ভোটের ফলাফলে যারপরনাই বিব্রত আমাজন কর্তৃপক্ষ। ভোটের পর এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই ফলাফলের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেবে তারা।

মালিকপক্ষের যুক্তি, শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করা হলে তা শ্রমিকদের সঙ্গে কোম্পানির সরাসরি সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এতে কর্মীদের মজুরিবৃদ্ধি বা চাকরির নিরাপত্তা থাকবে না। যদিও স্বয়ং প্রেসিডেন্ট বাইডেন এই ফলাফলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। ইউনিয়নের নেতাদের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বিবৃতি দিয়েছেন যে এর ফলে চাকরি হারানোর ঝুঁকি ছাড়াই কর্মপরিবেশের উন্নতি ও কর্মীবান্ধব কাজের সময়সূচি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই প্রেক্ষিতে আজকের আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী দিবস পালিত হবে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় পুঁজিবাদের পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮৬ সালের পয়লা মে তারিখে আট ঘণ্টার শ্রম দিবসের দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার পরিণতিতে চারদিন পরে শিকাগো শহরের হে মার্কেট অঞ্চলে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ওপরে পুলিশ গুলি চালায় এবং একজন আন্দোলনকারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এরপরে পুলিশ বলপূর্বক সমাবেশ ভাঙতে গেলে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি সেখানে বিস্ফোরণ ঘটায়—মোট এগারোজন মানুষের মৃত্যু হয় এর ফলে। এরপর বিচারের নামে শুরু হয় প্রহসন। মোট আটজনকে অভিযুক্ত করা হয় বিস্ফোরণের অভিযোগে, এবং এদের সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে পনেরো বছর কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়। মজার কথা, এই আটজনের মধ্যে ছ'জন সেদিন হে মার্কেট অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন না পর্যন্ত! এই আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ১৮৮৯ সালে প্যারিসে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সূচনালগ্নে পয়লা মে দিনটিকে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদী সমাজের কুৎসিততম রূপগুলো যখন দগদগে চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে, তখন শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের কথা আমাদের প্রতিনিয়ত চিৎকার করে বলতে হবে। মে দিবসের তাৎপর্য আজ আরো ব্যাপক, আরো বিস্তৃত। গণতন্ত্রের ধারণার চরমতম বিকৃতি ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র তার পেটোয়া পুঁজিপতি ও লগ্নিপুঁজির যৌথ স্বার্থে আত্মনিয়োজন করেছে। ভারতবর্ষে গত তিন বছরে একের পর এক জনবিরোধী আইন এবং লকডাউনকে হাতিয়ার করে শাসকগোষ্ঠী সস্তার শ্রমিকের জোগানকে নিশ্চিত করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

৭০০ শহীদের আত্মবলিদানে নয়া কৃষি আইন বাতিল করা গেলেও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, পরিবেশ বিষয়ক আইন, শ্রম আইন, অরণ্যের অধিকার আইন ইত্যাদির তরলিকরণের প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। মূলত বামপন্থীদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন দেশের রাজনীতিসচেতন মানুষ। ঐতিহাসিক মে দিবসকে সফল করার মাধ্যমে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানো আজ আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য। শাসক বিভাজনের রাজনীতির আশ্রয় নেবে, এ তো জানা কথা। কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষকে পরিচিতিসত্তার রাজনীতির ফাঁদ এড়িয়ে লাল ঝান্ডাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। মনে রাখতে হবে, একমাত্র শ্রমজীবী আন্তর্জাতিকতাই এই শোষণযন্ত্রকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে এক সাম্যবাদী ভোরের আবাহন ঘটাতে সক্ষম।

শ্রীলঙ্কা : ঋণ সমস্যা

৩-এর পাতার পর

অথবা পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘোষণা করলে ঋণ আইনি না বেআইনি সে প্রশ্ন ওঠে না। ঋণ সম্পূর্ণ আইনি হলেও ঋণশোধ স্থগিত থাকতে পারে। সাময়িকভাবে ঋণ পরিশোধ বন্ধ করা এবং সম্পত্তির উপরে ট্যাক্স বসানোর মাধ্যমে বর্তমান সমস্যার সমাধান হলও ভবিষ্যতে এই সমস্যার থেকে বাঁচতে শ্রীলঙ্কার উচিত নাগরিক ঋণ অডিট কমিটি তৈরি করা যা পরবর্তীতে যেকোনো ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সেই ঋণের প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তবিক গুরুত্ব নির্ধারণ করবে। এছাড়াও এই কমিটি অতীতের ঋণগুলি খতিয়ে দেখে কোনটা জনগণের স্বার্থে আর কোনটা নয় তা, চিহ্নিত করে ঋণশোধের পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। তা না করে সরকারের যথেচ্ছাচার চললে শ্রীলঙ্কার সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বার বার সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে বাধ্য হবেন।

ফিরে আসা যাক দ্বিতীয় প্রশ্নে যে, শ্রীলঙ্কার ঘটনার থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই। যেকোনো আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনা ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণ করে, শ্রীলঙ্কার ঘটনা এর ব্যতিক্রম নয়। ভারত, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, ভুটান সহ একাধিক দেশের বৈদেশিক ঋণের অবস্থা বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের ক্ষেত্রে যেখানে জিডিপি ও সরকারি ঋণের অনুপাত ৮৭.৭ শতাংশ, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যান ৭০ শতাংশ, মালদ্বীপের ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যান ২০২০ সালে পৌঁছেছিল ১৪৬.০৭ শতাংশ এবং ভুটানের ক্ষেত্রে ১০৬.৬১ শতাংশ। ফলে স্পষ্টতই অবিলম্বে এই দেশগুলিকেও ঋণের ফাঁদের বিপদ নিয়ে সতর্ক হতে হবে। নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে ঋণ অডিট কমিটি গঠন করতে হবে। অন্যথায় এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র নতুন নতুন শ্রীলঙ্কা তৈরি হবে। শ্রীলঙ্কাবাসীর বর্তমান অবস্থা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে।

সস্তায় বিক্রি এলআইসি'র শেয়ার

৩ মে—প্রথম শেয়ার বাজার আসার আগেই মোদী সরকারের বিরুদ্ধে এল আই সি'র মালিকানার একাংশ জলের দরে বেচে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। বিরোধীদের অভিযোগ, মোদী সরকার শেয়ারের বাজার দর কম করে দেখিয়ে জলের দরে শেয়ার বেচার ব্যবস্থা করছে। অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের অভিযোগ, এই কেলেঙ্কারির জন্য ৫৪ হাজার কোটি টাকা লোকসান হবে। কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রক আন্তর্জাতিক লগ্নিকারীদের কাছে মাথা নত করে বিপুল ছাড়ে শেয়ার বেচেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ইউক্রেন সঙ্কটের কারণে টালমাটাল অবস্থায় মোদী সরকার এলআইসি বিলগ্নীকরণের জন্য এমন উঠে পড়ে লেগেছে কেন? আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের জন্যই বোধ হয় এই তাড়াহুড়া! আশঙ্কা ছিল ভারত নিজে শিল্প তৈরি না করলে বণিকের মাণদন্ড আবার রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিতে পারে। দেশকে যাতে পুঁজি উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক কলোনি হয়ে বেঁচে থাকতে না নয়, তাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনে। ঐ সময়টা ছিল গড়ার সময়, আর এখন আত্মনির্ভর ভারত গড়ার নামে শুরু হয়েছে ভাঙ্গার পালা।

ভারতীয় জনতা পার্টির দাবি ইদের দিনে মসজিদ থেকে লাউডস্পীকার হঠাতে হবে

ইদের দিনে ধর্মস্থান থেকে লাউড স্পীকার হঠানোর জন্য আর এস এস-এর দাবি নিয়ে রাজধানীতে বিজেপি এবং আপ-এর মধ্যে বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ঘটনার সূত্রপাত এইভাবে :— বিজেপি'র দিল্লী ইউনিটের প্রধান অদেষ গুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের কাছে এক চিঠিতে দাবি করেন, শব্দদূষণের জন্য শহরে সব ধর্মস্থান থেকে লাউড স্পীকার সরাতে হবে। বেছে বেছে ইদের দিনটিতেই এই লিখিত দাবিটা প্রশাসনের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই চিঠির জবাবে, আম আদমি পার্টি অভিযোগ করে, অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই বিজেপি'র এই পত্রাঘাত। আম আদমি পার্টিকে বিজেপি'র পক্ষ থেকে পাল্টা জবাব দেয়—আমি আদমি পার্টি সংখ্যালঘুদের তোষণ করার জন্যই এই দাবির বিরোধিতায় নেমেছে। বিজেপি'র পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে মন্দিরে লাউড স্পীকার থাকলেও সেখানে কোনও শব্দদূষণ ঘটে না। পরে অবশ্য আম আদমি পার্টি থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে তারা নীতিগতভাবে প্রতিটি ধর্মস্থান থেকে লাউড স্পীকার সরানোর দাবি সমর্থন করছে।

করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বালুচ জঙ্গিদের হানা

২৬ এপ্রিল মঙ্গলবার করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণে এক আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে তিনজন চিনের নাগরিক এবং গাড়ির চালক নিহত হয়। বালুচ লিবারেশন আর্মি এই হামলার দায় স্বীকার করেছে এবং দাবি করেছে এই প্রথম এক মহিলা আত্মঘাতী জঙ্গি বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বালুচ লিবারেশন আর্মি ২০০৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের সফরকালে এক প্যারা মিলিটারী শিবিরের উপরও রকেট হামলা চালিয়েছিল।

বালুচদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং বালুচদের জন্য পৃথক সংরক্ষিত অঞ্চলের দাবিতে BLA নামে এই জঙ্গি গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। ইতিপূর্বে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মুশারফ মৎস্য উৎপাদনকারীদের নিবাস বালুচ সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী 'গদর' গ্রামটি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের স্বার্থে চিনের হাতে তুলে দেয়। ঘটনাটি বালুচরা মেনে নিতে পারেনি।

এই বন্দরটির নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হলে কারাকোরাম গিরিপথ থেকে আরব সাগরে চিনাদের পক্ষে পৌঁছানো খুব সহজ হতে পারে। বিগত দু' দশক ধরে BLA -র জঙ্গিদের বালুচিস্তানে রাজনৈতিক শাসনের দাবিতে আন্দোলন চলছে। এই অঞ্চলটি চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প এবং চিন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের মধ্যেই পড়ে। ফলে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত বালুচ জঙ্গি শুধু পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের উপরই নয়, চিনের উপরও খড়্গহস্ত।এই কারণেই সম্ভবত চিনের নাগরিকরাও জঙ্গিদের আক্রমণের লক্ষ্যের বাইরে নয়।

ত্রিপুরায় আর ওয়াই এফ-এর সভা

দীর্ঘ আড়াই বছর পর ০২.০৪.২০২২ রবিবার আর ওয়াই এফ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিনই আশু কর্মসূচি নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৭. ০৪. ২০২২ রাজ্যভিত্তিক কনভেনশনের দিন ধার্য করা হয়। ১৭.০৪.২০২২ আর ওয়াই এফ-এর রাজ্যভিত্তিক কনভেনশনে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ঐ দিনের কনভেনশন থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় কনভেনশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনজন প্রতিনিধির নাম চূড়ান্ত করা হয়।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-